সংকলন - ৬ । এপ্রিল ২০১৪

নবদিশা

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার সন্ধানে

‘গ্রাম শিক্ষা কমিটি’ নিয়ে নতুন তোড়জোড়

২০০২ সালে প্রচুর উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে যখন গ্রাম শিক্ষা কমিটি নিয়ে এ রাজ্যে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়, তখন থেকেই একদিকে যেমন আমরা এ নিয়ে ইতিবাচক কথাও শুনে আসছি, তেমন ভাবে অনেক নেতিবাচক কথাও এ নিয়ে বলা এবং লেখা হয়েছে। নেতিবাচক কথা যা বলা হয়েছে, তা যে সব মিথ্যা এবং উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা আমরা মনে করিনা। বিশেষত গত কয়েক বছর ধরে গ্রাম শিক্ষা কমিটি গুলি এ রাজ্যে যেভাবে কাজ করছিল তা যেমন বেশ কিছু বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে, তেমনই, এ নিয়ে যে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করার দরকার, নীতি-নির্ধারনের পরিসরে এর প্রয়োজনীয়তা আজ অনেকাংশে সকলে মেনে নিয়েছেন। যে কারনে সরকারী স্তরে, বিশেষত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং গ্রাম-সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধন এর জন্য, গ্রাম শিক্ষা কমিটি নিয়ে বিভিন্ন সি এল আর সি গুলো তে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে বলে আমাদের কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর আসতে শুরু করেছে।

গ্রাম শিক্ষা কমিটি নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনাগুলি সরকারের ভাবনা চিন্তার সাথে সব সময় খাপ খায় এরকম নয়, তবে গ্রাম স্তরে এ ধরনের যে কোন কাজ এবং চিন্তা ভাবনাগুলিকে আমরা বরাবর সামনে নিয়ে আসতে সরকার কে সহায়তা করেছি এবং এই সন্ধিক্ষনেও করবো। তবে আমাদের মনে হয়, যদি আগের রূপেই গ্রাম শিক্ষা কমিটি ফিরে আসে তাহলে তা খুব ইতিবাচক দিগন্তের সন্ধান দেবে না। আমরা মনে করি, শুধুমাত্র কিছু ন্যস্ত কাজেই নয়, গ্রাম শিক্ষা কমিটিকে শিক্ষার বিষয় নিয়েও চিন্তা ভাবনা করতে হবে।

এখানে গ্রামীণ শিক্ষার সাথে প্রতিদিনের জীবন যাত্রার মেলবন্ধন ঘটানোর দায়িত্ব নিতে হবে স্থানীয় সরকারকেই।

আমরা এমন একটা গ্রাম শিক্ষা কমিটি-র কথা ভাবি যা শুধুমাত্র কিছু ফরম্যাট পূরণের মধ্যেই নিজেকে সীমায়িত রাখবে না। আমরা মনে করি গ্রাম শিক্ষা কমিটি-র হাতে একটা স্তর অবধি অনেকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহন এবং প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা খুব জরুরী।

যদিও খেয়াল রাখতে হবে রাজনীতির বিষ যেন একে প্রভাবিত না করতে পারে, কেননা এর আগেও গ্রাম শিক্ষা কমিটি-র বিরুদ্ধে যে সব প্রধান অভিযোগ ছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল এর ভয়াবহ রাজনীতিকরন। ‘নবদিশা’ তার সীমিত ভাবনা এবং ব্যাপ্তি নিয়েও এর বি-রাজনীতিকরন এর জন্য প্রচার প্রসার চালিয়ে যাবে।

এর পাশাপাশি আরো যে সমস্ত স্বেচ্ছাব্রতী মানুষ এ নিয়ে নিরন্তর ভাবনা চিন্তা করছেন আজ সময় এসেছে তাদের সবাইকে নিয়ে একটা সাধারণ মঞ্চে এসে মিলিত হবার যেখান থেকে আমরা একটা মতামত তুলে ধরতে পারব।

বিশেষত যারা শিক্ষার অধিকার নিয়ে কাজ করছেন তারা যদি এ নিয়ে তাদের মতামত সামনে নিয়ে আসেন তবে নীতি-প্রণয়নের স্তরে এই ভাবনা গুলো দ্রুত ছড়িয়ে দিতে অনেক সুবিধা হতে পারে।

■■

এই সংকলনে ঃ

- কৃষ্ণমূর্তির শিক্ষাভাবনা
- রাধাকুমুদের প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ও স্থানীয়-শাসন ব্যবস্থা
- অতীশ দীপঙ্করের গল্প শোনাই
- এন সি এফ এর কিছু প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা
- ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছুটিতে কি করা যায়

মুক্ত আকাশের নিচে শিশুদের সৃষ্টির উল্লাস

ক্লান্ত দুপুরে পৌঁছে গিয়েছিলাম প্রত্যন্ত এক গ্রামীন অঞ্চলের বিদ্যালয়ে, কালিমাটি হাট মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে। স্কুল বলতেই আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে ক্লাস ঘর, ব্ল্যাকবোর্ড, সারিসারি বেঞ্চ, মাস্টার মশাইরা পড়াচ্ছেন আর ছেলেমেয়েরা মন দিয়ে পড়া শুনছে। আনন্দের অবকাশ এখানে নেই। বাইরের আকাশ বাতাসের সঙ্গে যেন তাদের আড়ি। এখানে এসে মনে হল, যেন শিশুরা নতুন খেলায় মেতে উঠেছে।

স্কুলের পাশে প্রকাণ্ড এক শস্য ক্ষেত্রে অযোধ্যা পাহাড়কে সাক্ষী রেখে নৃত্য, গানের নব ছন্দে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠছে। গ্রামেরই এক ষাটোর্ধ্ব সংস্কৃতিবান মানুষই নেচে গেয়ে শিশুদের শেখাচ্ছেন “ব্রতচারী”। মাষ্টারমশাইরাও শিশুদের সঙ্গে আনন্দ করছেন, গান গাইছেন। মাস্টারমশাইদেরও মনে হয়েছে একঘেয়ে জীবনের প্রাচীর ভেঙে বেরোতে না পারলে সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করা যায় না। এরকমই স্বপ্ন হয়তো দেখেছিলেন “ব্রতচারী” স্রষ্টা গুরুসদয় দত্ত কিন্তু তিনি দেখে যেতে পারেননি। গ্রামের স্কুলের গরীব ছেলেমেয়েরা হারিয়ে যাওয়া বাংলার এই প্রাচীন লোকনৃত্য, গীত - অযোধ্যা পাহাড়ের কোলে হাসিতে, আনন্দে লুটিয়ে পড়ে অনুশীলন করে চলেছে।

যে ভাবনা ২০০৫ এর জাতীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখার কাঠামোয় ফুটে উঠেছিল তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়ে চলেছে পুরুলিয়া জেলার বাঘমুন্ডি ব্লকের বুড়দা-কালিমাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কালিমাটি হাট মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের ছেলেমেয়েরা।

এভাবেও গড়ে তোলা যায়

প্রথম দিন স্কুলে ঢুকতেই চমকে উঠলাম। ৩ জন মাত্র ছাত্র। দোতলা, ৭ টা ঘরের স্কুল বাড়ি জুড়ে খাঁ খাঁ করা হতাশভাব। নিজেকে মনে মনে বোঝালাম এই জন্যই তো আসা। আমার সঙ্গে একই দিনে হাজির আরেকজন একই উদ্দেশ্য, নাম হাসানুর জামান। দু’দিন চার দিন নয় পরের দিনই আমি, হাসানুর আর স্কুলের স্থায়ী দিদিমণি শ্রাবণীদি মিলে কলোনি শুদ্ধ টইটই। কেউ ভাবলো এরা বোধহয় ছেলেধরা, চিটফাণ্ড, ধান্দাবাজ। কেউ বললো, “আপনাদের লাভ কি?” - “সরকারী স্কুলে কেন পড়াবো?” - “মেন রোড কে পার করে দেবে?” - আমাদের উত্তর, এক সপ্তাহ পাঠান, তারপর দেখুন ! ভালো লাগলে ভর্তি করাবেন নয়তো...। আর এর সঙ্গে আঁকা শেখা, নাচ শেখা, স্কুলে গাড়ি করে যাওয়া-আসা সবটাই ফ্রি।

এই ফ্রি-তে খানিকটা কাজ হল। ফ্রি-তে আজকাল কাজ হয়। ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকলো। ৩ জন কয়েক মাসেই ৫৪ জন হল। ১ম মাস থেকেই ফ্রি নাচের স্কুল চালু হল। শ্রেয়া সাহা কথা রেখেছে, সে আজও নাচ শেখায়। আমাদের স্কুলটার ভালো অবস্থার জন্য তার অবদান অনেক। এভাবেই চলছিল। মাঝে নিজেরাই মিলে মিশে ঘর রঙ হল, আঁকা আঁকিতে ভরে গেল। এবার আসি আসল কথায় – শোনা গেল আমাদের এই নারায়নপুর জি এস এফ পি স্কুলে প্রধান শিক্ষক আসছেন। ছোট থেকেই আমার প্রধান শিক্ষককে ভয়। তাদের নিয়ে বেশ কিছু ভয়ংকর স্মৃতি আছে তা হল –

১) ক্লাসে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকবে। একদম কথা নয়।

২) খাতায় কাটাকুটি কিংবা ছবি আঁকা চলবে না। খাতায় থাকবে অংক, অংক শুধু অংক।

৩) সায়েন্সে হাসির কোন জায়গা নেই অতএব হাসবে না। বিজ্ঞান ক্লাসে হাসা মানে বিজ্ঞানকে তুমি উপহাস করছ। এর জন্য শাস্তি হবে।

৪) শাস্তি চার প্রকার – কঠিন কুড়ি প্রশ্নমালার অংক, কানধরে উঠবোস, কিংবা ভীষন জোরে চিল চিৎকার সহযোগে বেতের আস্ফালন। এত্তসব স্মৃতি আমার ছেলেবেলার স্কুল স্মৃতিতে।

যাইহোক আমাদের স্কুল নারায়ন-পুর জি এস এফ পি তে সত্যি সত্যিই একজন প্রধান শিক্ষক এলেন। দিলীপ কুমার সাহা হলেন সেই শিক্ষক। খুব সাধারন কথাবার্তার এক প্রকার মানুষ থাকেন, যারা নীরবে কাজ করে যান তেমন মানুষ। পায়ে একটা সমস্যা নিয়েও আগে সাড়ে তিন/চার কিলোমিটার দূরের স্কুলে ধর্মঘটের দিন হেঁটে ঠিক সময়ে যাওয়া মানুষটা এই স্কুলে আসতে লাগলেন সাড়ে নটায়।

. . . এর পর শেষ পাতায়

নবদিশা পাঠকদের কাছে আহ্বান

শিক্ষাঙ্গনে নতুন দিশার খোঁজে শিক্ষক এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন তাঁদের চিন্তা – অভিজ্ঞতা বিনিময় করার মঞ্চ হল এই নবদিশা পত্রিকা।

আপনাদের মতামত, শিক্ষা নিয়ে নতুন চিন্তাভাবনা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে সাধারণ পাঠক্রমের বাইরে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমরা আশা করি নবদিশা পত্রিকার মাধ্যমে বিনিময় হবে।

জানার জন্য, শেখার জন্য ও জানানোর জন্য।

- আসুন, পথিক হন।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
৫/১/২/জি কর্নফিল্ড রোড, কলিকাতা – ৭০০ ০১৯
টেলিফোন নং – ৯১-৩৩-৬৫২২১০৯৭

সম্পাদকীয়

শিক্ষার বাকি ইতিহাস

" বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র, নানা ভাবে নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্রি।"

সুনির্মল বসু

শিক্ষা মানুষের জন্য আর শিক্ষার মধ্যে দিয়েই মানুষকে মানুষ হতে হয় । মানুষের ঘরে জন্ম নিলেই মানুষ হওয়া যায় না । তাই জরুরী তার জীবন ও জগত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করা । তার নিজের পরিচয় জানা, সে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় যাবে, পৃথিবীতে তার দায়িত্ব – কর্তব্য আছে কিনা, থাকলে তা কি ভাবে পালন করতে হবে এ সবই মানুষের শিক্ষার বিষয়। সঙ্গত কারনেই মানুষকে ভাবতে হয় শিক্ষার বিষয় ও তার পদ্ধতি নিয়ে। শিক্ষা শব্দটি নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক বিভ্রান্তি আছে। বই মুখস্থ করে পরীক্ষা দেওয়াই শিক্ষা আর সেই কর্মকাণ্ড হবে স্কুল নামক প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে। জীবনের সঙ্গে আঞ্চলিক পরিবেশের সঙ্গে কোন মিল নেই। আসলে জীবন যেমন হওয়া উচিত শিক্ষা ও তেমন হওয়া দরকার। জীবন ও শিক্ষা আসলে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ - এই ভাবনাটাই সাধারনভাবে নেই। একঘেয়ে নীরস পুঁথির পাতায় বন্দী হয়ে থাকে শৈশবের জীবন। শিক্ষকরাও আনন্দের সোনার কাঠি রুপোর কাঠির পরশ দিতে পারে না ছেলেমেয়েদের, তার ফলে অনেকেই স্কুল ছেড়ে দেয়। গ্রামের অনেক গরীব ছেলেমেয়েরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকার জগতের দিকে পা বাড়ায়। এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কেবল গ্রামীণ বেকারের সংখ্যাই বাড়াচ্ছে। অধিকাংশ পড়াশোনা শেষ করে না। কেননা তাদের অবস্থাটা এমন দাঁড়ায়, না পাবে শহরে চাকরি আর না পারবে গ্রামের কৃষির কাজ। মাঠের কাজ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে অনেকেই স্থানান্তরনের পথে পা বাড়াচ্ছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি হাতে কলমে দক্ষতা অর্জনের শিক্ষাকে যদি যোগ করা যায়, তাহলে ছেলেমেয়েরা নিজেদের পছন্দ মত পেশা বেছে নিয়ে গ্রামীন পরিবেশে সুন্দর জীবন যাপন করতে পারতো। যেমন ধরা যাক, ইস্কুলে ছেলেমেয়েরা গ্রামের একজন অভিজ্ঞ চাষির সাহায্য নিয়ে একটা পুষ্টি বাগান করলো ইস্কুল প্রাঙ্গণে। এর ফলে ছেলেমেয়েদের কৃষি বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করার একটা সুযোগ তৈরি হল। ছেলেমেয়েরা প্রকৃতি পাঠ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং প্রায়োগিক কৃষি শিক্ষার ওপর বাস্তব ধারণা লাভ করলো। বাগানের পরশে ছেলেমেয়েদের কৃষি মনস্কতা গড়ে উঠলো। এইভাবে বিদ্যালয়ের বাগান কৃষি শিক্ষার জীবন্ত বিদ্যাপীঠ রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটালো। এইখানেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে স্থানীয় সুযোগ সুবিধা ভিত্তিক শিক্ষার সংযোগ গড়ে উঠলো। শুধু জীবিকা নয় স্থানীয় ভূগোল, ইতিহাস, সমাজের যে গনতান্ত্রিক স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান আছে, যাকে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত বলি তা জানতে ও বুঝতে হবে, বিদ্যালয়ের মধ্যে তার চর্চা করতে হবে।

এ তো গেল স্থানীয় চাহিদা, আর একটা দিক আছে যেটা বস্তু দিয়ে বোঝা যায় না অন্তর দিয়ে বুঝতে হয়। সেটা হল নিজেকে জানা, এই জানার নামই শিক্ষা। মনে রাখতে হবে, মানুষ হচ্ছে দৈহিক ও আত্মিক জীব। শুধু মাত্র জীবিকা নির্ভর শিক্ষা নয় পরিপূর্ণ মানুষ রূপে ছেলেমেয়েরা যাতে নিজেকে মেলে ধরতে পারে, সেটা শিক্ষার একটা বড় দিক। আর এক দিকে মানুষের যে ধর্ম সেটাও শিক্ষার অঙ্গ। যেমন ধরা যাক ফকির-ফ্যাকড়া, সুফি-ভক্তির শক্তিশালী ধারা যা আমাদের সমাজকে আগে টিকিয়ে রেখেছিল যার সঙ্গে জীবনযাপনের বিশেষ চর্চার প্রশ্ন জড়িত ছিল। মানুষের বাইরে একদিকে প্রকৃতি এবং অন্যদিকে অপরাপর মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের চর্চার সুনির্দিষ্ট ধারার মধ্যেই তাদের বয়ান গড়ে উঠেছে। এইগুলোও শিক্ষার একটা বড় ধারা। যা আমাদের মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের একটা সেতু বন্ধন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মানব ধার্মিক এই বিষয়টা শিক্ষাঙ্গনে বাচ্চাদের মধ্যে চর্চার কোন সুযোগ নেই। অথচ আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধনটা আলগা হয়ে যাচ্ছে ততই এটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। তাই শিক্ষার কাজ হল জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়াটা বোঝাবার জন্য আমাদের প্রস্তুত করা।

শিক্ষকের আলাপ

পুর্ব শাকদল প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্রী ঘনশ্যাম পাল (সহকারী শিক্ষক) শাকদল – ভেটাগুরি - কোচবিহার

আমি একজন গ্রামের বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসেবে মনে করি যে সমস্ত বই আগের অর্থাৎ ২০১৩ ও ২০১৪ ইং সালে পেয়েছি সে সমস্ত বই আরও আগের অর্থাৎ ২০১১ ও ২০১২ ইং সালের তুলনায় একদমই অন্য রকম। ২০১৩ ইং সালে প্রাক প্রাথমিক শুরু হয়েছে এদের যে বই অর্থাৎ "কাটুমকুটুম" এতে বেশির ভাগ অংশ আঁকিবুঁকির মধ্যে দিয়ে জোড় দেওয়া হয়েছে। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাবা-মায়েদের অক্লান্ত চেষ্টায় পাঁচ বছরের ছেলেমেয়েরা সাধারণত স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, সংখ্যার ধারনা করতে পারছে, বেশির ভাগ বাচ্চারা মোটামুটি পড়তে বা লিখতে পারে । কাজেই যেমন "সকলের তরে সকলেই আমরা" তাদের জন্য বইটিতে যদি আঁকিবুঁকি ও প্রথম ভাগটি যাতে রপ্ত করানোর উপযোগী ছবিগুলি কালারফুল হয় তবে পাঠটি আরো আনন্দদায়ক হবে। যেমন ছোটো ছোটো ছড়া ও আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করতে পারলে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে মেলবন্ধন সুন্দর করা যেতে পারে। দিনে দিনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে গিয়ে পাবলিক বিদ্যালয়ে ভিড় বাড়ছে কাজেই সকলের চেষ্টায় বিদ্যালয়ের পরিবেশকে আনন্দ মুখর পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে ভবিষ্যতে প্রতিটি বিদ্যালয়ের বিদ্যাদেবীর পুজা অর্চনা ও মন্ত্র পাঠের লোক থাকবে না। বলা বাহুল্য কথাটা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছাবে জানি না। মনের থেকে বলছি, গ্রামের পরিবেশের সাথে শহরের পরিবেশের এখনও অনেক ফারাক রয়েই গেছে, আপনারা যারা এর সাথে যুক্ত আছেন কিংবা কমিটিতে আছেন যদি শহরে বসে এই সব চিন্তা ভাবনা করে থাকেন তবে আপনাদের বলা বাহুল্য নয় অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে রইল আমন্ত্রণ একবার গ্রামের পরিবেশ দেখবার জন্য। অনিচ্ছা স্বত্তেও বলতে হয় এখানে বি পি এল শ্রেনীভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি থাকবার কারনে তাদের একটা বিরাট অংশ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর লেখা –

"শিশুপুষ্প আঁখি মেলি হেরিল এ ধরা
শ্যামল, সুন্দর, স্নিগ্ধ, গীতগন্ধ ভরা;
বিশ্ব জগতেরে ডাকি কহিল হে প্রিয়
আমি যতকাল থাকি তুমিও থাকিও।"

কিছু কিছু জায়গায় তাদের ইচ্ছে থাকলেও উপায় থাকে না কারন অভিভাবকদের কাজের সন্ধানে অন্যের উপর নির্ভর হতে হয় বাড়িতে দেখার কেহই থাকে না। শিশুমন খেলার তালে বিদ্যালয়ের সময় অতিক্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে। এই পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাদের পড়াতে পারছেন না, কাজেই তাদের খামতি থেকেই যাচ্ছে। বললে হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবে না অনেক অভিভাবকদের সঙ্গে গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথা হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রেই শোনা যায় চাষার ছেলে কি আর অফিসের বড়বাবু হবে ? তারা চাষাই হবে। কিন্তু একটা কথা বারবার উঠে আসে পাঠ্য বইতে যে ভাবে করা আছে সেভাবেই করার ও শেখার দিকে যেতে হবে। যদি সেই দিকেই যেতে হয় তবে মনে হয় প্রথম শ্রেনী ও তৃতীয় শ্রেনীর পাঠ্য বই-এর দিকে দেখতে গেলে যেন ৭০ ভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাথা ঘুরে যাচ্ছে। যে কি পড়ব ও কি পড়াব। মনে হচ্ছে যেন কোনোটার সাথে কোনো মিল নেই। যদি কিনা নিজের মতো অর্থাৎ সহজ পদ্ধতিতে বোঝানোর দিকে যাওয়া যায় তবে পাঠ্য বই-এর ভাষাতে বা লেখাতে অন্য হয়ে যায় বিশেষ করে গণিত বিষয়ের স্থানীয় মান, গুনোন ও ভাগের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের সেই 'মাষ্টারবাবু' মনে পড়ে ? –

"আমি আজ কানাই মাষ্টার,
পোড়ো মোর বেড়াল ছানাটি।
আমি ওকে মারিনে মা, বেত
মিছি মিছি বসি নিয়ে কাঠি
রোজ রোজ দেরি করে আসে
পড়াতে দেয়না ও তো মন,
ডান পা তুলিয়ে তোলা হাই
যত আমি বলি 'শোন্ শোন্'।
দিন রাত খেলা খেলা খেলা
লেখা পড়ায় ভারি হেলা
আমি বলি চ, ছ, জ , ঝ, ঞ
ও কেবল বলে মিয়ো মিয়ো।"

অংক ক্লাসে গেলে সেই দেবব্রত দত্ত-র লেখা –

ক্লাস ফোরের অঙ্কস্যার গগন কুমার সেন
ক্লাসে গিয়ে ব্ল্যাক বোর্ডেতে অঙ্ক কষাচ্ছেন
হঠাৎ দেখি রেগে গিয়ে ছাত্র ডেকে, তিনি –
ধমক দিলেন – একই ভুল করছ প্রতিদিনই !
হোমটাস্ক করতে দিলে, ভুল করবে রোজই ?
বাবার সাথে দেখা হোক, জানিয়ে দেব আজই
ছাত্র বলে – লাভ হবে না, দিয়ে এসব জ্ঞান,
প্রতিদিনই অঙ্কগুলো বাবাই কষে দেন।

'আমাদের বই' সম্পর্কে

তালমন্দিরা এফ পি স্কুলের শ্রী ভানু চ্যাটার্জ্জি ও শ্রীমতী মঞ্জু ঘোষ, বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর

'আমার বই' সম্পর্কে আলোচনা করি। বইটি আমাদের কাছে অতুলনীয়। বইটি ঠিক মতো পড়াতে পারলে দ্বিতীয় বইটি অর্থাৎ 'সহজপাঠ' পড়ানোর প্রয়োজন হবে না, কিন্তু এই বই বহন করা ছয় বছরের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। এই বইয়ের কর্মপত্রগুলি যদি আলাদা করে দেওয়া হতো এবং আরও বেশি বেশি কর্মক্ষেত্র দেওয়া হতো এবং কর্মপত্রগুলি বিদ্যালয়ে রাখা হতো তবে বইগুলি বহন করার পক্ষে কষ্ট অনেক কম হতো।

এই বইয়ের ইংরেজি কবিতাগুলি ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ দেয় না। বেশ কিছু ইংরেজি শব্দ আছে যা বাঙলা করলে সংযুক্ত অক্ষর এসে যায় এবং কঠিনও হয় যেমনঃ- Hanging , Kangaroo , Across , Cloud , Flap । আবার বইয়ের কিছু কিছু ছবি স্পষ্ট নয়। যেমন – ১১০ পাতার ছবিগুলি।

এবার আসি পরিকাঠামোর দিকে। এই বইয়ের পড়ানোর মতো পরিকাঠামো বিদ্যালয়ে এখনও গড়ে ওঠেনি। বাড়িতে পড়ার জন্য শিক্ষকদের অতিরিক্ত কোনো কপি দেওয়া থাকে না। বিদ্যালয়ে পড়ার মতো পরিবেশও থাকে না। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কম হওয়ার জন্য দুইজন শিক্ষককে ৫টি ক্লাস সামলাতে হয়। একটি ক্লাসকেই মন দিয়ে পড়ানো যায় না। কর্মপত্রগুলিও ঠিকমতো করানো যায় না। বইটিতে ২৩০ পৃষ্ঠা পড়াতে হবে, অথচ আমরা সব মিলিয়ে ১৮০ দিন পড়াতে পারি। একবার করে যদি পড়ান হয় তারা এই সব পড়া মনে রাখতে পারবে কি? এই বইগুলি পড়াতে গেলে প্রতি শ্রেণীর জন্য একজন করে শিক্ষক দেওয়া প্রয়োজন ছাত্র যতজনই হোক।

শিক্ষকদের কিছু অসুবিধে

বর্তমানে মিড-ডে-মিল এবং তার খাতাগুলি সামলানো, বাজার করা, রেশন থেকে চাল আনা, বিডিও অফিসে দৌড়দৌড়ি করা, এতে একজন শিক্ষকের যে কত সময় লাগে তার হিসাব কর্তৃপক্ষ রাখেন কি ?

ইলেকশনের জন্য প্রধান শিক্ষককে বেশ কিছু সময় দিতে হয়, তখন নাম তুলতে চতুর্থ শ্রেণীর সার্টিফিকেট লাগে। সেই সমস্ত নামগুলি খুঁজে বের করে প্রধান শিক্ষককে সার্টিফিকেট দিতে হয়।

শ্রেণীকক্ষ থাকা সত্ত্বেও একটি কক্ষে ৩টি ক্লাস পড়াতে হয়। ফলে সঠিক ভাবে পড়ানো যায় না।

প্রধান শিক্ষক আবার দুটি স্কুলের Administrator । তাকে Building repair, Maintenances Grant এবং School Grant-এর কাজগুলি দেখতে হয়। এর জন্য প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বেশ কিছু সময় দিতে হয়।

উপরিউক্ত সমস্যাগুলি তুলে ধরা হলো এই ভেবে যে, আমাদের অসুবিধাগুলি না জানালে এই বৃহৎ প্রয়াস সম্পূর্ণ হবে না।

শ্রী ভানু চ্যাটার্জ্জি ও
শ্রীমতী মঞ্জু ঘোষ

পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষায় কয়েকটি ইতিবাচক দিক

- শিক্ষাব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক হয়ে ওঠার ঝোঁক কমে যায়
- পড়ুয়াদের যথাযথ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকা অনেক বেশি দায়বদ্ধ হন
- বিদ্যালয়গুলি যথেষ্টভাবে স্ব-শাসনের ক্ষমতা অর্জন করে
- পড়ুয়াদের চাহিদার প্রতি অনেক বেশি নজর রাখা যায়
- স্থানীয় জনজীবন, প্রকৃতি-পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে জানার উদ্দীপনা বাড়ে
- নিজস্ব পরিবেশে পড়ুয়ারা বিভিন্ন সামর্থ্য অর্জনের অধিকারী হয়
- পড়ুয়ারা চারপাশের পরিবেশ, জীবন ও জগৎ নিয়ে পর্যবেক্ষন করতে পারে
- পর্যবেক্ষণ করা বিষয়ের সঙ্গে শ্রেণিকক্ষের পাঠ্যসূচি নির্ভর বিষয় ও তথ্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন সহজ হয়
- শিশু মনে নানান কৌতূহল ও প্রশ্ন জাগে, পাঠ্যসূচির বিষয় সম্বন্ধে কৌতূহল বাড়ে। তাতে সৃজন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
- শিশু 'জানা থেকে অজানায়' এবং 'মূর্ত থেকে বিমূর্তের' অভিমুখে অগ্রসর হতে পারে। ফলে, নিজের অঞ্চলের পরিধি ছাড়িয়ে বিশ্বসমাজের সদস্য হয়ে ওঠে।

National Curriculum Framework (2005)

বাংলা সংস্করণ - পৃষ্ঠাঃ ৫

জাতীয়পাঠক্রমের কিছু উল্লেখ্যযোগ্য অংশ

মৌখিক ও হস্তশিল্পের ঐতিহ্য

ঐতিহ্য হল বিশেষ বৌদ্ধিক সম্পত্তি। যা বৈচিত্র্যময় ও সূক্ষ্ম। আমাদের সমাজ অগণিত মহিলা, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও উপজাতি দ্বারা রক্ষিত। সব শিশুর পাঠক্রমে এগুলিকে যুক্ত করলে আমরা জ্ঞানের জন্য বোঝাপড়া এবং ধারনার মর্মবস্তু, দক্ষতা ও ক্ষমতা লাভের জানালা খুলে দিতে পারি। যাতে তারা বিভিন্ন উদ্ভাবনের দ্বারা তাদের জীবন ও সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

অন্যদিকে দেখা যায় – স্কুলগুলি শিক্ষিত মানুষকে এই সুযোগ করে দেয়। অথচ আর একদল অনেকক্ষেত্রে অবহেলিত থাকে। আমরা বলতে চাই – মৌখিক ও হস্তশিল্পের এই সবক্ষেত্র অবহেলা করা সঙ্গত নয়। স্থানীয় স্বাক্ষরতাকে যেকোনো ভাবে রক্ষাকরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

National Curriculum Framework (2005)

বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠাঃ ২৫

স্থানীয় জ্ঞান-ঐতিহ্য শিক্ষায় জ্ঞানের ভাণ্ডার

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী এবং ব্যক্তিগণ দেশের পরিবেশ এবং সংস্কৃতি সংক্রান্ত জ্ঞানের এক ভাণ্ডার, যা তারা তাদের পূর্বতন প্রজন্মগুলি থেকে পেয়েছেন ঐতিহ্য হিসাবে অথবা ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এই জ্ঞান হতে পারে বিভিন্ন উদ্ভিদের নামকরণ এবং বর্গীকরণ সংক্রান্ত, জল সংরক্ষণের পদ্ধতি অথবা সুস্থায়ী কৃষি সংক্রান্ত, কোনো কোনো সময় এই সব জ্ঞান এবং বিষয়-ভাবনা থেকে ভিন্ন ধরনেরও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হলো না। এমনবস্থায় শিক্ষক শিশুদের সহায়তা করতে পারেন স্থানীয় ঐতিহ্য এবং জনগোষ্ঠীর বাস্তুতান্ত্রিক জ্ঞানের উপরে প্রকল্প করার জন্য যেখানে বিদ্যালয়ের বিষয় ভাবনার সাথে এই ঐতিহ্য – নিয়ন্ত্রিত ভাবনার পার্থক্যও অঙ্গীভূত হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো দুইধরনের জ্ঞান পদ্ধতি সমান্তরাল হতে পারবে বা একই রকম হতে পারে যেমন বিভিন্ন রোগ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ে অনুশীলিত জ্ঞান স্থানীয় জ্ঞান এবং বিশ্বাসের পুরোপুরি বিপরীত এবং বৈরীও হতে পারে। যাই হোক স্থানীয় জ্ঞানের সমস্ত প্রকরণ সঞ্চারিত হতে হবে এবং নীতির মধ্য দিয়েই।

National Curriculum Framework (2005)

পৃষ্ঠাঃ ৩২

দেশের মানুষের ও পরিবেশের চরিত্র অনুসারে শিক্ষা পদ্ধতি তৈরি হওয়া দরকার।
শিক্ষা হবে প্রতিদিনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ। চলবে তার সঙ্গে একতালে একসুরে। সেটা ক্লাস নামধারী খাঁচার হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নতুন 'আমার বই' এবং শিশুকেন্দ্রিক পাঠপ্রক্রিয়ার নতুন দিশার অনুসন্ধানে

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং এ রাজ্যের অগ্রনী শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষাচিন্তার সাথে ওতপ্রতভাবে যুক্ত বিভিন্ন মানুষজনকে নিয়ে ও প্রধানত 'জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা ২০০৫' এবং 'শিক্ষার অধিকার ২০০৯' এর ধারনাগত প্রেক্ষিতের সাথে সঙ্গতি রেখে, বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যবইগুলি প্রসঙ্গে যে নতুন বিবেচনা এবং অনুপুঙ্খ বিশ্লেষন শুরু হয়, তার ফল হিসেবে আমরা পেয়েছি প্রায় সব শ্রেণীর নতুন বই। যে বইগুলি বিগত দু'বছরে সারা দেশজুড়ে এবং বিশেষত এ রাজ্যে অনেক নতুন ভাবনার উৎসমুখ খুলে দিয়েছে। নবদিশার এই সঙ্কলনে আমরা আলোচনার জন্য নির্বাচন করে নিয়েছি প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 'আমার বই' সংকলন দুটি।

দু'খানি ক্লাশের বইতেই আমরা যে শ্রেণী-শিখনের প্রধান ভিত্তির কথা পেয়েছি সেগুলি হলো শিশু বিষয়ক শিক্ষা, হাতে কলমে প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষা, সমন্বিত শিখণ এবং আনন্দময় শিক্ষা।

প্রথম শ্রেণীর 'আমার বই'

প্রথমশ্রেণীর 'আমার বই'-এর মধ্যে বাংলা, ইংরাজী এবং গণিত এই তিনটি প্রধান ভিত্তি বিষয়কে নিয়ে সুসমন্বিত আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। প্রক্রিয়াটি যেহেতু তুলনায় নতুন তাই এখনো পরীক্ষা-নীরিক্ষার সময় চলে যায় নি, সেজন্য প্রতি পাতায় দেওয়া হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ শিখন পরামর্শ। সাড়ে তিনশো পৃষ্ঠাব্যাপী এই বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় আছে অসাধারন হাতে আঁকা ছবি, যা শিশুর ছবি-দেখার রুচি বিকাশের পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী হবে বলে আমাদের ধারনা। একদম প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই পাঠ-প্রক্রিয়ায় স্থান করে নিয়েছে গ্রাম এবং গ্রামীণ জীবনের সরলতা। এখানে বর্ণ চেনা এবং শব্দভান্ডারের নির্মাণ ও সৃজনের জন্য বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের ওপরে নির্ভর করা হয়েছে। বইয়ের প্রাক-কথনে এই সমগ্র উদ্যোগের প্রধান পুরুষ অধ্যাপক অভীক মজুমদার এই বইয়ের 'কৃত্যালি নির্ভর' শিখন প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন। যেমন বহু সময় শিখন পরামর্শে বলা হয়েছে, কোনো কবিতা পড়ানোর সময় শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে অভিনয়ের আশ্রয় নিতে পারেন। আবার বিশেষ করে যেখানে অংকের পাঠ দেওয়া হচ্ছে, সেখানে শিশুকে এমন অনেক ধরনের বহুমাত্রিক কাজের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা আছে, যা ঠিক ভাবে সৃজনী প্রয়োগ করতে পারলে অনেক নতুন সম্ভাবনার দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারব।

এই প্রথম শ্রেণীর "আমার বই"-এর অন্যতম প্রধান দিক বলে আমাদের মনে হয় প্রতিটি পাঠ্যের অনুষঙ্গে শিশুর অভিজ্ঞতার সাথে পৃথিবীর সহবাস। যেমন, ১৭০ পাতায় 'কাঁচা আম' নামক একটি ছড়ায় যেখানে কবি সুখলতা রাও বৈশাখের ঝড়ে আম ঝরে পড়া এবং তা কুড়োনোর আনন্দময় অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। এটি যখন শিশু পাঠ করবে, সেখানে শিখন পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষককে কিছু জিনিষ খেয়াল রাখতে হবে। বৈশাখের প্রকৃতি নিয়ে শিশুর ভাবনার সাথে পড়ানোকে যেমন সম্পৃক্ত হতে হবে, আবার অন্য দিকে অন্যান্য ঋতুগুলির সাথে এর পার্থক্য এবং সাদৃশ্য প্রসঙ্গেও যেন তাদের মনে ধারণা সৃষ্টি হয়। অন্য দিকে যেমন ২১৮ পাতায় যে গদ্যাংশ আছে সেখানে বিভিন্ন পাখির প্রসঙ্গে রূপকথা ধরনের যে আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা পাখি

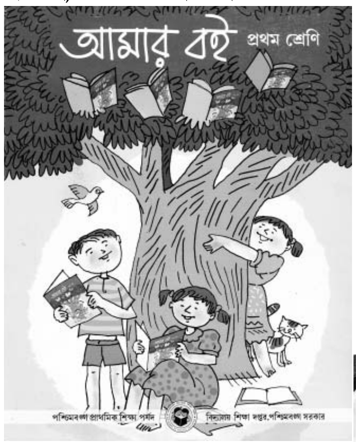

প্রসঙ্গে যেমন জানবে, তার সাথে সাথে বৈচিত্রের উদ্ভাস প্রসঙ্গেও সংবেদনশীল হয়ে উঠবে। আবার ২৫৩ পাতায় যেখানে গাছ প্রসঙ্গে একটি গদ্যাংশ রয়েছে, সেখানে শিক্ষার্থীরা গাছের বিভিন্ন অংশের প্রসঙ্গে যেমন জানবে তেমন ভাবেই, যা এই পাতার নীচে শিখন-পরামর্শে বলা হয়েছে যে শিক্ষার্থীরা পাঠটি সহজ পাঠের 'কাল ছিল ডাল খালি'র ভিত্তি পাঠ হিসাবে পড়বে, সেখানে গাছের শরীর এবং তার নিজস্ব সৌন্দর্য দুই-ই যেন প্রমূর্ত হয়ে ওঠে শিশু-শিক্ষার্থীর সামনে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর 'আমার বই'

দ্বিতীয় শ্রেণীর "আমার বই" কে যদি প্রথম শ্রেণীর ধারাবাহিকতায় দেখি, তবে তা নতুন অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে শিশুর অভিজ্ঞতার পরিসর একটু বেশী। বস্তু – রং – বর্ণ সম্পর্কে তার চেতনায় একটু স্পষ্টতা এসেছে, পুরো বাক্য পাঠ করার দক্ষতা সৃষ্টি হয়েছে। এই পর্বে আমরা দেখেছি গদ্যাংশগুলি তুলনায় একটু বড় এবং তারা বিষয়গতভাবে আগের শ্রেণীর তুলনায় একটু জটিল। এখানে পুন্যলতা চক্রবর্তীর 'বাদল দিনে', সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর 'বারোমেসে', সুখলতা রাও-এর 'অন্যখানে', শঙ্খ ঘোষের 'বেলুন বাড়ি'র পাশাপাশি রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'আগুনের পরশমণি'। এখানে আরো অন্যান্য যেসব গদ্য-পদ্যাংশগুলি আমরা পেয়েছি তা শিশুমনে উন্নত নন্দনবোধ

সমৃদ্ধ সাহিত্য ভাবনার প্রতি আকর্ষণ তৈরী করে। যখন উপেন্দ্রকিশোর-এর 'মেঘের মুলুক'-এর মতো চিত্রকল্প-সমৃদ্ধ দার্জিলিং ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ানো হবে, তা যেন একই সাথে ভ্রমণ কাহিনী এবং লেখকের দেখা দার্জিলিং-এর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। আবার অন্যদিকে আমরা যখন শিশুদের লীলা মজুমদারের 'হাতির মা' পাঠ করাবো, তখন হাতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ছাড়াও যেন সামনে আসে প্রাণী সমাজের মমত্ববোধ এবং তা যেন সঞ্চারিত হয় শিশুর বোধের গহনে।

এখানে যে অংক এবং দ্বিতীয়ভাষা হিসাবে ইংরেজীর পাঠ নির্বাচন করা হয়েছে, সেখানে পদ্ধতিগতভাবে প্রথম শ্রেণীর সম্প্রসারনের দিকটাই মাথায় রাখা হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এবং সেজন্য যদি খুব সন্তর্পনে যেখানে অংক এবং ইংরাজী আলোচনা করা হয়েছে, যদি সেই অংশগুলি পাঠ করি তবে দেখা যাবে এখানে বস্তু পৃথিবীকে আশ্রয় করা হয়েছে অনেক বেশী মাত্রায়। এখানে এই অংক শিক্ষণে খুব জরুরী হয়ে উঠেছে ছবির ব্যবহার এবং বিভিন্ন খেলার প্রয়োগ। যেমন লুডোর ছক ব্যবহারের মাধ্যমে যোগবিয়োগের সরল নিয়মকানুনগুলো খুব আনন্দময় প্রক্রিয়ায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং লুডো ছক ব্যবহারের জন্য শিশুর আনন্দ প্রক্রিয়া অনেক ত্বরান্বিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

খুব সীমিত পরিসরে আমরা দুটি "আমার বই" প্রসঙ্গে আলোচনা রাখলাম এবং এইভাবে আমরা অন্যান্য বইগুলি প্রসঙ্গেও আলোচনাতে যাবো। তবে যা আমাদের কাম্য, তাহল শিক্ষা যেন জীবনকেন্দ্রিকতাকে ছুঁয়ে থাকে এবং আমাদের মতে তাহলেই সৃষ্টি হবে নতুন প্রানবন্ত একটি প্রজন্ম, যাদের মর্মে রয়েছে সুপরিচ্ছন্ন সংস্কৃতিবোধ এবং তার সাথে প্রতিদিনের বাস্তবতাকে পাঠ্য বইয়ের নিরিখে মিলিয়ে দেখার দক্ষতা।

■■

কবিতার কথা

সুন্দরবনের বিপদ-সঙ্কুল অঞ্চলে দারিদ্র-জর্জরিত একটি পরিবারের গৃহবধূর শান্ত লড়াইকে আমরা নিচের প্রতিবেদনে তুলে ধরলাম।

কবিতা মন্ডল, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের গোবিন্দকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের গুমটি হাটখোলার বাসিন্দা। দুই ছেলে মেয়ে আর স্বামী নিয়ে তার অভাবের সংসার। নিজের ১ কাঠা জমিও নেই ফসল ফলানোর জন্য। ২০০৯ তে আয়লার পর থেকে বাড়ি সংলগ্ন যে এক চিলতে জমি ছিল সেখানেও আর কিছু ফলাতে পারেনি কবিতারা। সপ্তাহে ১ দিন স্থানীয় হাটে ভাজাভুজির একটি দোকান দেয় তার স্বামী। এই দোকান থেকে যে ২০০-৩০০ টাকা আসত তাতেই চালাতে হত পুরো সপ্তাহ। যতক্ষণ কিনে আনার ক্ষমতা থাকত ততসময় খেতে পারত আর বাকি সময় অর্ধাহার ও অনাহারে চলত তাদের জীবনযাত্রা।

এত কষ্টের মধ্যে থেকেও কবিতা মনে মনে এক সুপ্ত ইচ্ছা পোষণ করত যে, বাড়ির সামনের এক চিলতে জায়গায় সে সব্জীবাগান করবে যেখান থেকে সে সব্জী ফলিয়ে বাড়ির কাজে লাগাবে আর যদি বাড়তি কিছু থাকে তাহলে বিক্রি করে সংসারের সচ্ছলতা আনবে। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও বীজ কেনার সাধ্য বা সামর্থ কিছুই ছিলনা তার।

এইরকম পরিস্থিতিতে এই ধরণের পরিবারগুলির পাশে এসে দাঁড়াল স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত। কবিতা এবং কবিতার মত আরো কিছু পরিবার সব্জীবাগান করার বীজ পেল স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। স্থানীয় এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন পশ্চিম শ্রীধরকাটি জন কল্যাণ সমিতির সহায়তায় তারা শুরু করল বাড়ির সামনের এক চিলতে জমিতে সব্জীবাগান।

কবিতার বাগানে এখন ফলছে শশা, উচ্ছে, ঝিঙে, ভেন্ডী আরো কত কি। বাড়ির সব্জী বাগান থেকেই সে এখন পাচ্ছে দৈনন্দিন সব্জীর যোগান। সব্জী কেনার জন্য তাকে আর বাজারে যেতে হয় না। কিছুটা আবার সে বিক্রিও করছে আর সেই পয়সায় সে এখন সংসারের অন্যান্য চাহিদাও কিছুটা মেটাচ্ছে।

এই সব্জী থেকে কবিতা পরেরবারের জন্য বীজও সংগ্রহ করে রাখছে যাতে পরেরবার আর কারো মুখাপেক্ষী হয়ে না থাকতে হয়। আশপাশের বাড়ির থেকেও বীজের জন্য, সব্জীর জন্য চাহিদা আসছে কবিতার কাছে। আর কবিতার নিজের মুখের কথা হল “ তারাও লাগাক, তারাও ফসল করুক, আমাদেরও চলুক, তাদেরও চলুক - এইভাবে গরীব মানুষের জন্য তো গরীব মানুষ-ই পাশে থাকে।”

বিভিন্ন ছুটিতে গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু উদ্ভাবনী পরিকল্পনা

সারা বছরে জুড়ে বিভিন্ন ছুটিগুলিতে গ্রামীণ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে নানারকম পরিকল্পনা করা যেতে পারে, যেগুলি তাদের পুর্নাঙ্গ বিকাশে খুব জরুরী। এ কাজে শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই নন, স্থানীয় পঞ্চায়েত, গ্রাম শিক্ষা সমিতি সকলেই উদ্যোগ নিতে পারেন)

যেহেতু আর দু-তিন মাসের মধ্যেই বিদ্যালয়গুলিতে এসে যাবে গরমের ছুটি নামক ‘মধুমাস’। তাই সেই অবকাশের মুহূর্তগুলিকে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আরো বাঙ্ময় করে তোলার জন্য আমরা তুলে ধরছি একগুচ্ছ নমনীয় পরিকল্পনা। এগুলি স্থানীয় ‘পরিপ্রেক্ষিত’ এবং ‘বাস্তবতা’ মাথায় রেখে যদি প্রয়োগ করা যায় তাহলে ‘বিদ্যাঙ্গন’ হয়ে উঠতে পারে প্রকৃতি অর্থে আনন্দের আবাসভূমি। প্রধানত গরমের ছুটি’র কথা ভেবে লেখা হলেও এইসব পরিকল্পনা যে কোনও ছুটির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

প্রথমতঃ- এপ্রিলের শেষ সপ্তাহের মধ্যে প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্থির করতে হবে যে গ্রীষ্ম অবকাশের পুরো সময়টির মধ্যে কতটা সময় তারা এই ‘অন্যশিক্ষা’র জন্য ‘ব্যয়’ করবেন। এবং তা জানাতে হবে সমস্ত অভিভাবকদের এবং সেখানে প্রতিজন শিক্ষককে খুব সুচারু এবং যুক্তিপ্রানিত ও বোধগম্য ভাষায় তুলে ধরতে হবে এই সব নতুন নতুন পরিকল্পনা কি ভাবে পাঠ্যসূচীর-ই সম্প্রসারিত রূপ। যেমন কালচিনি অথবা বানারহাটের কোনো শিক্ষক যদি স্থির করেন হাতির আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য গরমের ছুটির মধ্যেই তিনি শিশু এবং কিশোরদের নিয়ে কয়েকদিনের কর্মশালা করতে চান, তাহলে তিনি যখন অভিভাবকদের সেকথা বোঝাবেন, তখন খুব সুন্দর এবং সুস্পষ্ট ভাবে তাকে বলতে হবে যে এই কর্মশালা আসলে প্রতিদিন তারা যে পরিবেশবিদ্যা পড়ে, তাকে বাস্তবের সক্রিয়তায় নিয়ে আসার পথ।

দ্বিতীয়তঃ- ‘নবদিশা’ এমন এক শিক্ষার এবং শিক্ষাব্যবস্থার স্বপক্ষে যুক্তি সম্প্রসারিত করে, যেখানে দেশ এবং অঞ্চলের ঐতিহ্য এবং ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই আমাদের প্রস্তাব, যদি অঞ্চলে কোনো ঐতিহ্য উপাদান থেকে থাকে সেগুলির ইতিহাস গুরুত্ব এবং তাৎপর্য প্রসঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন এবং তাদের সংরক্ষণ এবং মানোন্নয়নে সক্রিয় করে তুলতে কিছু কর্মশালা খুব প্রয়োজনীয়। এখানে মাথায় রাখতে হবে খুব পরিচিত ঐতিহ্য উপাদান-যেমন হাজারদুয়ারী অথবা ইমামবাড়া-তা যেমন তুলে ধরা প্রয়োজন তেমনই তুলে ধরতে হবে অনেক স্বল্প-পরিচিত বা প্রায় অপরিচিত ঐতিহ্যগুলিকেও।

তৃতীয়তঃ- আমাদের দেশ এবং এই রাজ্য বহুধা-বিস্তৃত জীববৈচিত্রের ধারক। সেজন্য আজ যখন বাজার-কেন্দ্রিক উন্নয়ন নির্মম ঔদাসীন্য এবং বল্গাহীন ঔদ্ধত্য এক ধরনের একমাত্রিকতাকেই উন্নয়নের পথ হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে, তখন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই প্রাকৃতিক বৈচিত্র সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিগুলি প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান এবং তথ্য তুলে ধরা খুব জরুরী। যেমন ধরা যাক সুন্দরবনের ধান্য প্রজাতির প্রসঙ্গে শিক্ষক যখন ছাত্রছাত্রীদের বলবেন, তখন তার ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবে যেন স্থান পায় আমাদের কেন এই ধান্য প্রজাতির চাষ আবার ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তার ইতিবাচক দিকগুলি কোথায়। শুধু তাই নয় এর পুষ্টিগুণ নিয়েও শিক্ষক মহাশয়কে খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে। এখানে সরেজমিনে ক্ষেত্র-পরিদর্শন খুব প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ সুন্দরবনে যে অক্ষরজ্ঞানহীন কৃষক অঞ্চলের কৃষি বৈচিত্র রক্ষার সংগ্রামে অজান্তে যুদ্ধরত, সেই কৃষকের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে তার কাছ থেকে ছাত্রছাত্রীদের বুঝে নিতে হবে কিভাবে বিভিন্নতাই হতে পারে সুস্থায়ী বসুন্ধরার বেঁচে থাকার মৌলিক সুর।

চতুর্থতঃ- আমাদের রাজ্যের একদম দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে বিস্তৃত সমুদ্রতট যেখানে জলজ-বৈচিত্র প্রতীয়মান। তাই যদি পূর্ব মেদিনীপুরের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের সামনে এই বৈচিত্রের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলতে চান, তাহলে মেরিন ইকো-সিস্টেম নিয়ে গবেষনারত বিজ্ঞানীর তুলনায় দীঘা-শংকরপুর-জুনপুটের মৎসজীবি সম্প্রদায়ের বংশপরম্পরা লালিত জ্ঞান এবং তথ্য ছাত্রছাত্রীদের কাছে বেশী প্রাসঙ্গিক এবং আকর্ষনীয় হতে পারে। গরমের ছুটিতে দুদিন সমুদ্র অঞ্চলে ঘুরে ফিরে বেড়াবার যে আনন্দময় যন্ত্রনা তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে ছাত্রছাত্রীদের কাছে, যদি সেখানে প্রতিটি তুচ্ছ জিনিসের মধ্যে যুক্তি খুঁজে নেওয়ার পদ্ধতি ধরিয়ে দেন শিক্ষক মহাশয়।

পঞ্চমতঃ- পুষ্টিশিক্ষা আজ সারা পৃথিবীতে খুব গুরুত্ব এবং তাৎপর্য নিয়ে বিরাজমান। শিশু-কিশোরদের সুস্থ বিকাশে পুষ্টি – স্বাস্থ্য চেতনা এমন এক গুরুত্ব সম্মলিত উপাদান যেখানে পাঠ্যসূচিকে সেইমত সাজানো এবং সম্প্রসারিত করা খুব জরুরী। তাই গ্রামীন শিক্ষাঙ্গনে যেখানে দ্বি-প্রাহরিক আহার আজ এক মহাযজ্ঞের স্থান নিয়েছে এবং বহু মহলের আপত্তি এবং সমালোচনা সত্ত্বেও এখনো সরকারী সহায়তা নিয়ে বিরাজমান, সেখানে যদি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জায়গা পাওয়া যায় তাহলে খুব ভালো, তা না হলে বিদ্যালয় সংলগ্ন অব্যবহৃত জমিতে তৈরি হতে পারে পুষ্টি প্রদানকারী সবজী বাগান। এই সবজী বাগান যখন ছাত্রছাত্রীরা করবে শিক্ষকদের দেখতে হবে তা যেন ছাত্রছাত্রীদের কাছে নতুন আনন্দের পরিসর হতে পারে। এখানে প্রতিটি বীজ ছাত্রছাত্রীরা যেমন নিজের হাতে ধরে চিনতে এবং তা রোপণ করার পদ্ধতি এবং পরিচর্যা করার প্রনালী শিখবে, তেমন ভাবে অনুপুঙ্খ ভাবে জানবে প্রতিটি সবজীর পুষ্টিগত গুণাবলীগুলি। গ্রামীন শিক্ষাঙ্গনে পুষ্টি-বাগান হতে পারে এবারের গ্রীষ্মাবকাশ-এর প্রধানতম কাজ। কারণ সবসময় যদি কাছে দূরে যাওয়া সম্ভব নাও হয়, তবেও যেন আমাদের ছাত্রছাত্রীরা পেতে পারে প্রকৃত বন্ধু কৃষি-পদ্ধতির অনুশীলনের স্বাদ-গন্ধ এবং অভিজ্ঞতা। তার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ খুব জরুরী। এর মধ্য দিয়ে খুব ছোটবেলা থেকেই আমরা পাবো নতুন ভাবে বাঁচার সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক অনুপ্রেরনা, আর খুব ছোটবেলা থেকেই আমাদের ছাত্রছাত্রীরা শিখবে সুপরিকল্পনার মাধ্যমে এবং সুস্থায়ী পদ্ধতি প্রকরণের প্রয়োগে কিভাবে চাষ ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে সঙ্কট অতিক্রমে শক্তি সমৃদ্ধ। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যেন পুষ্টিবাগানগুলি গ্রামের প্রবহমান কৃষিব্যবস্থার অঙ্গও হয় আবার ব্যতিক্রমীও হয়। যেমন যে অঞ্চলের কৃষকরা পুরোপুরি অভ্যস্থ হয়েছেন রাসায়নিক সার-বিষে, তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা যেন পুষ্টিবাগান থেকে জৈবকৃষির বার্তা নিয়ে ঘরে ফেরে। এই কাজে নতুন সিলেবাসের পাঠ্যবই গুলি, যা আমরা এ রাজ্যে অনুশীলন করছি সেগুলি ব্যবহার করার কথা আমরা ভাবতে পারি।

ষষ্ঠতঃ- নবদিশা-ভাবনা স্থানীয় লোকসংস্কৃতির পরম্পরা এবং ঐতিহ্যের সামূহিক বিকাশে এবং সম্প্রসারণের খুব গুরুত্ব দেয়। এবারের গরমের ছুটিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রীরা শিখতে পারে স্থানীয় সংস্কৃতির আধারে লালিত কোনো শিল্প মাধ্যম।

সপ্তমতঃ- আমাদের ভাবতে হবে ছাত্রছাত্রীদের নন্দনতত্ব এবং শিল্প মাধ্যমগুলির চর্চার জন্য আসন্ন গ্রীষ্মকালীন অবকাশকে আমরা কতদূর পর্যন্ত কাজে লাগাতে পারি। নতুন যে সিলেবাস আমরা এরাজ্যে পেয়েছি তা বাঙলা সাহিত্যের মনিমুক্ত দিয়ে ঘেরা। সেখানে যেমন একদিকে আছে ‘পথের পাঁচালী’ , তেমন আছে ‘আদাব’ যেমন আছে ‘তালনবমী’ অথবা জয়গোস্বামী বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা, তেমন রয়েছে লীলা মজুমদারের ‘মাকু’। এইতো সময় ছাত্রছাত্রীদের নতুন ধারার সাহিত্য অথবা চলচ্চিত্রের বিষয়ে আগ্রাহী করে তোলার। এজন্য চলচ্চিত্রের পাঠ এবং চর্চা খুব প্রয়োজন।

এবারের ছুটিতে তাই শিক্ষাঙ্গনে যেমন ছাত্রছাত্রীরা দেখতে পারে ‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’, ‘ছুটি’, ‘অতিথি’, ‘কাবুলিওয়ালা’ বা ‘দামু’ র মতো ছবিগুলি, তেমনই যদি গ্রহণ করা যায় পাঠ-উৎসবের উদ্যোগ যেখানে ছবি-গান-কবিতা দিয়ে ছাত্রছাত্রীরা যাপন করবে কয়েকটা দিন, তবে তা হতে পারে অনেক তাৎপর্যপ্রানিত।

প্রিয় পাঠক, আমরা তুলে ধরলাম আমাদের জরুরী কিছু নমনীয় পরিকল্পনা, সেগুলির মধ্যদিয়ে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি শিক্ষাঙ্গনে নতুন সৃজন সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আমাদের ভাবনাগুলি। এর অর্থ এরকম নয় যে এগুলির মধ্য দিয়ে আমরা সীমাবদ্ধ রাখতে বলছি। আজ সারা দেশ জুড়ে বিনাশের অন্ধযাত্রা চলছে, যদি সেখানে নিয়ে আসতে হয় ‘নবধারা-নবদিশা-নবপ্রান’, যদি প্রতিরোধ করতে হয় অবক্ষয়ের বাতাবরণটিকে, তবে যে শিশুরা এখনো বাজার-সভ্যতার মতাদর্শের মারন-বিষ থেকে দূরে তাদের ওপরেই নির্ভর করতে হবে সবথেকে বেশী।

■■

নবদিশা

অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শিশু মনে নতুন তরঙ্গ সৃষ্টির সম্ভাবনা

অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমের ব্যবহার আজ অভিজাত বিদ্যায়তনগুলিতে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এ নিয়ে নানা পত্রপত্রিকায় আমরা প্রচুর লেখা দেখছি, যেখানে শিশুর মনন এবং পাঠদান প্রক্রিয়ার মাঝে এইসব উপাদানগুলি কি ভূমিকা নিতে পারে, তা নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ন আলোচনা থাকে, যেগুলি পড়ে আজ যারা শিক্ষণের বিষয়ে আগ্রহী তারা অনেক সমৃদ্ধ হতে পারবেন। তবে এখনো পর্যন্ত গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমের ব্যবহার খুব সামান্য বা প্রায় নেই বললেই হয়। এখানেই খুব প্রয়োজন গ্রামের বিদ্যালয়ে অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমের ব্যবহার আরো বৃদ্ধি করা। গ্রামের শিশু কিশোরদের জন্য, বিশেষতঃ আমাদের পশ্চিমবঙ্গে অনেক চিন্তা-ভাবনা সিলেবাস নিয়ে হচ্ছে এবং তার জন্য বেশ কিছু নতুন ধরনের ইতিবাচক সাড়া আমরা পেয়েছি। তবে নতুন সিলেবাসের সাথেই শুধু তাল মেলাতে গেলে আবার পাঠ্য বই কেন্দ্রিক হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তবে যদি স্থানীয় সংস্কৃতি, লোকায়ত জ্ঞান এবং পুষ্টি-স্বাস্থ্য নিয়ে ছোট ছোট ছবি বানিয়ে সেগুলি ক্লাসে দেখানো যায়, তবে তা শিশু মনে নতুন বোধের তরঙ্গ তুলে দিতে পারে। এখানে প্রধানতঃ যেগুলি তাদের স্থানীয় পরিসর থেকে জানা দরকার, সেগুলির ওপর জোর দিতে হবে বেশী। শিশুর নিজস্ব সংসদ এলাকায় যে অফুরন্ত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পদের অমূল্য ভান্ডার বিদ্যমান, তা যদি 'অডিও-ভিসুয়াল' মাধ্যম বাহিত হয়ে তার কাছে না পৌঁছে যায়, তবে আগামী দিনে সে তার গ্রাম, তার সাংস্কৃতিক নিজস্বতা নিয়ে বিন্দুমাত্র গর্ববোধ করবে না। গ্রামের বিদ্যালয়ে অপু-র জীবনসংগ্রামের কাহিনী দেখানো যেতেই পারে, তবে যে শিশু অপুর 'উচ্চাকাঙ্খা'-র দিকে ঝুঁকে পড়লো, সেকি কখনো বীজ শোধন, চারা তৈরী এবং স্থানীয় বাজারে তা বিক্রিতে উৎসাহিত হবে? সে তখন অনেক বেশী আগ্রহী হবে শহরের সুযোগ সুবিধাগুলি নিয়ে অপুর মতো 'জ্ঞান-অনুসন্ধানী' হয়ে উঠতে। আসলে অডিও-ভিসুয়াল উপাদানগুলি যেন শিশুকে অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্খী করে না তোলে তার দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। মূল কথা হলো জীবন যাপনের সক্ষমতা অর্জনের জন্য অডিও-ভিসুয়াল উপাদানগুলি শিশুকে সহায়তা করলো কিনা। সেজন্য তথাকথিত 'মহান' শিল্পকর্মের তুলনায় কিভাবে সংসদ এলাকায় 'যা আছে – যতটুকু আছে' তাই দিয়েই সৃষ্টি হবে জীবন-জীবিকার ভিত, সেগুলি দেখানোই খুব জরুরী। বিভিন্ন গাছ, সেই সব গাছের প্রয়োজনীয়তা, চারা তৈরীর পদ্ধতি, এলাকায় কোন কোন মাছের ডিম ফুটিয়ে ভালো আয় হতে পারে, এগুলি নিয়ে ছবি দেখলে শিশু কিশোরদের মধ্যে 'উচ্চাকাঙ্খা'র মারন বিষ আমরা ঠেকাতে পারবো। এর পাশাপাশি গ্রামের শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য পুষ্টি নিয়ে ছবি দেখানোও খুব প্রয়োজন। কারণ নানাধরনের অসুখে ভুগে তাদের পরিবারে অনেক খরচা হয়ে যায়। যদি খুব সহজে কিভাবে সুস্থ থাকা যায়, তা নিয়ে আমরা শিশুদের সচেতন করতে পারি, তবে তাই হবে আমাদের সাফল্য।

■■

অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যম

শিক্ষার্থীদের জন্যে তথ্যমূলক রচনা এবং বিশ্বকোষ রচনার সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভাবে বিকাশ লাভ করেনি। 'নেট' দেখে বিভিন্ন 'সাইট'-এ যেসব ভালো মানের অডিও এবং ভিডিও উপাদান আছে সে সম্বন্ধে ও ওয়াকিবহাল হয়ে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষকদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক এবং হ্যাণ্ডবুক তৈরি করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতেই ধ্রুপদি (অঙ্গের) সিনেমাগুলিকে প্রাপ্তিযোগ্য করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ, একটি শিশু যখন গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে পড়ছে তখন তার কাছে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালি (সিনেমা দেখা) সহজলভ্য হওয়া দরকার – তা সে CRC থেকে আনা CD-র মাধ্যমেই হোক বা জাতীয় ওয়েবসাইটে দেখা হোক। পাঠ্যপুস্তক গুলো এমন ভাবে রচিত হওয়া উচিত যাতে বিভিন্ন বিষয় এবং নানা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের স্বীকরণ (জ্ঞানকে আত্মস্থ করা) সহজতর হয়ে ওঠে। যেমন, একটি হাইস্কুলের জন্যে লিখিত পাঠ্যবইতে যেখানে রাজস্থানের ইতিহাস নিয়ে অলোচনা করা হচ্ছে আর মীরার নামের উল্লেখ আছে সেখানে তাঁর রচিত (অন্তত) একটি ভজনের বাণীরূপ যেন দেওয়া থাকে ; সেই সঙ্গে জানানো থাকে কোন সাইটে ভজনগুলি রক্ষিত আছে যাতে শিশুরা 'এস এস সুব্বুলক্ষ্মী'র গলায় সেই গান শুনতে সমর্থ হয়।

National Curriculum Framework (2005) পৃষ্ঠাঃ ৩২

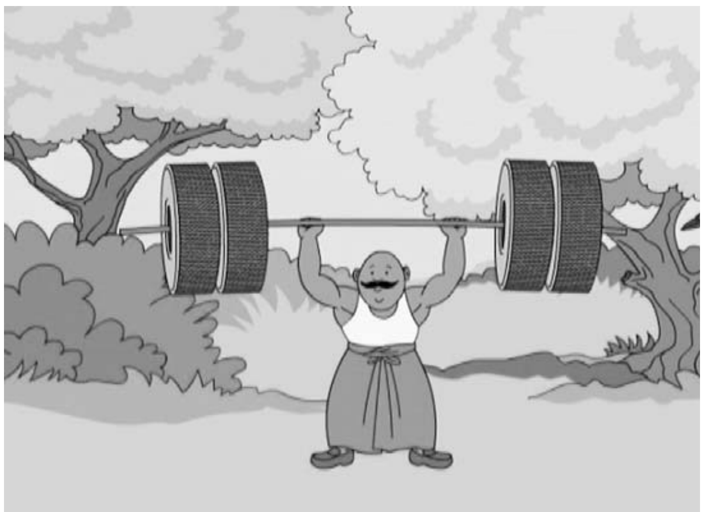

অ্যাহেড ইনিসিয়েটিভ্স্-এর তৈরি 'ওস্তাদ সিং আর মশার গল্প'

আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে কিছু অডিওভিজুয়ালের বিবর্রণ যা নবদিশা'র কাছে লিখিত আবেদন জানালে পাওয়া যাবে।

এসো তাঁদের গল্প শোনাই

অতীশ দীপঙ্কর

বাংলা আর বাঙ্গালি বললেই কী মনে আসে ? সবুজ খেত, নদনদী, জলা জঙ্গল, মশা-মাছি, নারকোল গাছ, আম-গাছ, পুলি পিঠে, মাছ-ভাত, দুপুরের ভাত ঘুম, গড়িমসি, দেদার আড্ডা - আরো কত কি!

যদি বলি এক বাঙালি সমুদ্র পেরিয়েছিলেন, বরফ ঢাকা হিমালয় পেরিয়েছিলেন এবং তাও আবার হাজার বছর আগে। বিশ্বাস হবে? যদি বলি, তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক, মাস্টারমশাই। শিক্ষার খোঁজে, শিক্ষা পৌঁছে দিতে দেশ-গ্রাম ছেড়েছিলেন।

এমনটাই হয়েছিল। হাজার বছর আগে। ১০৫৪ সাল - তিব্বত দেশের ঞেথাও শহরের কোলে এক বৌদ্ধ মন্দির। মন্দির ঘরের বিছানায় মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এক বৃদ্ধ। ইনিই সেই বাঙালি মাষ্টার। ৭২ ছুঁইছুঁই বয়স। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর। পায়ের কাছে বসে রয়েছে তিব্বতি শিষ্য ডোম তান পা। প্রিয় প্রভু 'জোবো জে'-র (বাংলা ভাষায় মহাপুরুষ) কথা শুনছে সে প্রাণ দিয়ে। বড়ই ক্ষীণ সুরের কথা বলছেন মাষ্টার মশাই। বলছেন ভালো ভাবে বাঁচার পথের কথা, অন্যের ভালোর জন্য জীবনভর কীভাবে বাঁচা যায় তার কথা। শিক্ষা তো তাই-ই দেয়। সবাই মিলে সুস্থভাবে বাঁচার পথ দেখায়। আর শিক্ষক তো শিক্ষার মাধ্যমে সেই পথেরই হদিশ দেন। গত বারো বছর তিব্বত দেশটা চষে বেড়িয়েছেন তিনি। গ্রামে গঞ্জে, শহরের প্রতিটি ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে কথা বলেছেন মানুষের সঙ্গে। তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজের আদর্শ। ভালোভাবে জীবন ধারণের উপায় বলেছেন। ভালো ব্যবহারের পথ দেখিয়েছেন। বলেছেন সেই ধর্মকথা যা মনের অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, মানুষে মানুষে রেশারেশি দূর করে। সারা তিব্বত জুড়ে অনেক শিষ্য তাঁর। বই লিখিয়েছেন, অনুবাদ করিয়েছেন অনেক পুঁথিপত্র। এমনকি রোগ চিকিৎসা আর সেবা নিয়ে তার বই রয়েছে। কীভাবে সব্বাই মিলে একে অন্যের কষ্টকে দূর করে, সুস্থ ভাবে বাঁচা যায় তার কথা বলে বেড়িয়েছেন। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর এই শিক্ষা। সেটাই তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিব্বতের ঘরে ঘরে।

৯৮২ খ্রিষ্টাব্দ। আজ থেকে এক হাজার বত্রিশ বছর আগেকার বাংলা। সেই বাংলার বিক্রমপুরের ব্রজযোগিনী নগর। সেই নগরে রাজার বাড়ি। আর এই রাজবংশে জন্মেছিলেন তিব্বতের সেই শিক্ষাগুরু। নাম ছিল তার চন্দ্রগর্ভ। রাজার ঘরে জন্মালেও রাজা হতে চাননি। "আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে" – এই ভেবে বেরিয়ে পড়েছিলেন শেখার জন্য। নানান শাস্ত্র, গুরু ঘুরে বৌদ্ধ ধর্ম তাঁকে আকর্ষণ করে। ক্রমশ তিনি বৌদ্ধ শাস্ত্রে মহান পণ্ডিত হয়ে ওঠেন এবং নাম নেন দীপঙ্কর। তিব্বতে তাঁর নাম অতীশ দীপঙ্কর। বৌদ্ধশাস্ত্র শিখতে তখনকার ভারতের পূর্বদিকের সব বৌদ্ধরা বিশ্ববিদ্যালয় (যাকে বলা হতো বিহার) গেছেন। এমনকি দেশ পেরিয়ে, সমুদ্র পেরিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় গেছেন - শুধু মাত্র শিখতে, জানতে। দেশে ফিরে এসে বৌদ্ধ শিক্ষা প্রচার শুরু করেন। এমন সময় ডাক আসে তিব্বত থেকে। তিব্বত বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস করলেও এখানে তা সঠিক ভাবে পালন করা হতো না। তিব্বতে তখন ধর্মের নামে চলছিল অনাচার, মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁকের চর্চা। দেশটা উচ্ছৃঙ্খলতা আর গা-জোয়ারিতে ভরে গেছিল। তখন সময়টা ১০৪০ খৃষ্টাব্দ। ডাক পাঠালেন তিব্বতের ঞারি প্রদেশের রাজা –" মহাপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে এসে দেশবাসীকে রক্ষা করুন, পথ দেখান"। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে অতীশ দীপঙ্কর পাড়ি দিলেন তিব্বতের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে নিলেন পুঁথিপত্র আর দোভাষী এক সঙ্গী। পাহাড়ি দুর্গম পথ ধরে পৌঁছালেন তিব্বত। ভারতের সীমান্ত পেরোচ্ছেন। জ্ঞানী দীপঙ্করের পথে পড়ল তিনটে কুকুর ছানা। পুঁথিপত্রের সঙ্গে তারাও স্থান পেল। আচার্য দীপঙ্করের সঙ্গে ওই প্রজাতির কুকুর পৌঁছে গেল তিব্বত দেশে।

অতীশ দীপঙ্কর মারা যান ঞেথাও মন্দিরে। রেখে যান তাঁর শিক্ষা – মানবতার শিক্ষা। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে। "কখনো নিজের জন্যে কিছু করবে না; এমন কী নিজের জন্য বাড়িয়ে যাবে না পুণ্যের সঞ্চয়"– তাঁর কথাটি মনে রেখেছেন তাঁর শিষ্যরা। তিব্বত জুড়ে তাঁরা অতীশের ভাগ করে নেওয়া শিক্ষার চর্চা করে চলেছেন।

■■

রাধাকুমুদের ভাবনায় প্রাচীন ভারতের স্থানীয়-শাসন ব্যবস্থা

আজ প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসন-চর্চায় রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় খুব একটি আলোচিত নাম নন। এমনকি রাষ্ট্র-প্রসবিত ইতিহাস ভাবনাও তাকে বহুলাংশে ব্রাত্য করে রেখেছে। তবুও মধ্যমেধার কর্তৃত্বে যখন মরচে ধরে যায়, তখনই নতুন ইস্পাতের মতো ঝলসে ওঠেন রাধাকুমুদের মতো মানুষেরা। আমরা চমকে তাকাই তার অনুচ্ছেদে অনুচ্ছেদে বুনে দেওয়া চিন্তার অসীম আলোকে। এবারের আলোচনা তার যে বইটি নিয়ে তার প্রকাশকাল ১৯১৯, তখনও পূর্ণ-স্বরাজের দাবী সামনে আসতে শুরু করেনি। পুরোনো ধাঁচের স্থানীয় উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থা ভাঙছে এবং একরৈখিক পুঁজির সাথে সাযুজ্য সম্বলিত একটি ব্যবস্থা সামনে আসছে। এরই মাঝে তার এই মহাগ্রন্থ সৃষ্টি করলো চিন্তার নতুন প্রেক্ষিত। প্রাচীন ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন ভাবনায় তিনি নতুন দিক চিহ্ন অনুপ্রবিষ্ট করালেন। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণে তার লেখায় উঠে এলো ‘সুশাসিত’ সমাজকেন্দ্রিক ভারতবর্ষ এবং তার নিরন্তর ইতিহাসের জটিল অভিযাত্রা। ‘লোকাল গভর্ণমেন্ট ইন এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া’ নামক বইটি তুলে ধরেছে শুধু শাসন পরম্পরা নয়, কৌম সমাজের সাথে তার সম্পর্কের অনন্য চিহ্নগুলি। রাধাকুমুদের সত্য অনুসারী ইতিহাসের প্রধান চিন্তাভূমি অনুসন্ধান-নির্ভর এবং অনুসন্ধানের প্রতি স্তরে তিনি বুনে দিতে পারেন ইতিহাসের অনন্য ‘অবজেক্টিভ’ নির্যাসবিন্দুগুলি। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে প্রারম্ভিক বিবেচনার মধ্য দিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন নিজস্ব তত্ত্বসৌধ। এই অধ্যায়েই পুরো গ্রন্থটিকে উঁচু তারে বেঁধে দিয়েছেন রাধাকুমুদ। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থার নির্যাস বর্ননা করতে গিয়ে তিনি খুব সার্থকতার সঙ্গে দেখিয়েছেন কিভাবে সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বের চরম পেষনেও নিজস্ব কৌম-ভিত্তি নিয়ে টিকে ছিলো প্রাচীন ভারতীয় সমাজ। তিনি এই অধ্যায়েই জানিয়ে দিয়েছেন কেন এই ভারতীয় প্রশাসন চিন্তা অন্য এবং অনন্য। রাষ্ট্র এই দীর্ঘ সময় পর্বে ন্যুনতম অনতিক্রম্য হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করেনি। এর মধ্য দিয়ে তিনি যেমন বহুলাংশে যৌথ কৌম সমাজের ধারনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আবার তেমন ভাবেই আমাদের প্রতি মুহূর্তে সতর্ক করেছেন, যেন নির্দ্বন্দ্ব ভারত এরকম কোনো ধারণার কবলে আমরা না পড়ি। প্রতিটি ভারতীয় গ্রাম যেন এককেকটি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের মতো, মন্টেগু-চেমস ফোর্ড এর প্রতিবেদনে এই সত্য তারা তুলে এনেছেন। তবে এ ধরনের ভাবনার সাথে যদি আমরা রাধাকুমুদকে সরাসরি সংযুক্ত করে ফেলি তবে তা তার মেধার প্রতি অবিচার হবে। রাধাকুমুদ প্রশ্নার্ত হয়েছেন, মাইসোর থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ভারতীয় সাম্রাজ্য কি সম্ভব হতো, যদি না থাকত স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থার ওপরে নির্ভর করে সৃষ্টি হওয়া স্থানীয় স্বায়ত্ত ব্যবস্থার জালিকা বিন্যাস। রাধাকুমুদ প্রাচীনতার গন্ধে আমোদিত কখন হননি, যা পুরানো তাই মহান এরকম কোনো সম্মোহন তার নেই। তবে তিনি যখন ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্নবিবরণী দিচ্ছেন, তখন বিন্দুমাত্র বিমূর্ততার স্পর্শ বাঁচানো তার পক্ষে খুব শক্ত একথা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে প্রাচীন নথির প্রেক্ষিতে গিল্ডের ইতিহাস। বিশেষত সামাজিক সংস্থান সংক্রান্ত চর্চা খুব জরুরী ভূমিকা নিয়েছে এই অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে এই সব গিল্ডের গঠনগত দিক এবং তাদের নিহিত সম্পর্কের জটিলতা। যারা আধুনিক প্রশাসন বিদ্যাচর্চায় আগ্রহী তাদের এই অধ্যায়টি অনেক নব নব ভাবনার রসদ দিতে সহায়তা করবে। চতুর্থ অধ্যায় দু'পর্বে বিন্যস্ত। এখানে প্রশাসনিক কাজ এবং যন্ত্র বিন্যাস দুই-এর ওপরে আরো অনুপুঙ্খ আলো ফেলেছেন রাধাকুমুদ। পঞ্চম অধ্যায়ে রাধাকুমুদ দেখিয়েছেন এই স্থানীয় প্রশাসনের ন্যায়-বিচার ভাবনা এবং তার প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের দেখাতে এবং প্রমান করতে সক্ষম হয়েছেন যে এই ছিলো স্থানীয় প্রশাসন-প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক। ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন পৌর কার্য সম্পাদনের প্রনালী। রাধাকুমুদ প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারতের নগর প্রশাসন ভাবনার মেধা চঞ্চল বুদ্ধিদীপ্ততার সরণী অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়েছেন এখানে। সপ্তম অধ্যায়ে তিনি আলোচনায় এনেছেন এইসব প্রশাসনের সাংবিধানিকতার জায়গাগুলি। অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কিছু বিশেষ বিশেষ নগর প্রশাসন এবং তাদের অন্তর্জটিলতা। নবম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে জনপ্রশাসনের প্রতিষ্ঠান এবং তাদের দক্ষতা ও কার্য সম্পাদনের কুশলতা।

এবারে প্রশ্ন হলো উন্নয়ন কর্মীরা কেন এই মহাগ্রন্থের সাথে সহবাস করবেন এবং এই গ্রন্থপরিণয় তাদের কি দেবে ? প্রথমতঃ প্রজ্ঞার আলো, দ্বিতীয়তঃ বীক্ষার রৌদ্র, তৃতীয়তঃ মননের তেজ, চতুর্থতঃ সুপরিচ্ছন্ন ইতিহাস চেতনা, পঞ্চমতঃ বিশ্লেষনী পারমিতা এবং অনেক তথ্যের ভাণ্ডার যা দিয়ে তারা নির্মান করতে পারবেন রাষ্ট্র অতিরিক্ত ভাবনার সৌধ, যেখানে অদৃশ্য ইতিহাস-পুরুষ শান্ত রাধাকুমুদ আমাদের চলতে শেখাচ্ছেন শুভ কর্ম পথে।

রাধাকুমুদের বিশ্লেষণে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা

মহীরুহ প্রতিম পাণ্ডিত্যের বিচ্ছুরণে তাঁর অনায়াসসাধ্য দক্ষতা প্রমাণিত হয়েছে বহু গ্রন্থে, তাঁর সুনিবিড় প্রজ্ঞায় চমকিত হয়েছে ইতিহাসের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা-পীঠগুলি, তাঁর গভীর অনুপুঙ্খ সহকারে রচিত ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন সময় পর্বগুলি আমাদের সামনে আজও প্রধান আকর হিসাবে পরিগণিত, তিনি রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। পরিব্যাপ্ত মধ্যমেধার জগতে তিনি আজ অনেকাংশে ঝাপসা হয়ে এসেছেন। আজ আমাদের বিজ্ঞাপন-মথিত বিদ্যাচর্চার জগতে তিনি বহুলাংশেই অনালোচিত। তবু যারা শিক্ষার বিভিন্ন প্রেক্ষিতে তাদের কর্মকাণ্ড এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, তাদের যদি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ভাবনা এবং ব্যবস্থার ধূসর স্নায়ু পথে পরিভ্রমণ করতে হয়, তবে অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হতে পারে রাধাকুমুদের অসামান্য নির্মাণ ‘এনশিয়েন্ট ইণ্ডিয়ান এডুকেশন – ব্রাহ্মিনিকাল অ্যান্ড বুদ্ধিষ্ট’ নামক মহা-গ্রন্থটি, যার প্রতি ছত্রে, অনুচ্ছেদে বিপুল তথ্যের নিপুণ সমাহারে তিনি তুলে ধরেছেন আবছা হয়ে আসা ভারতের অন্য এক ছবি। যে ছবি তিনি প্রামাণ্য দলিলের সমাহারে মূর্ত করে তুলেছেন এক অপূর্ব, অভূতপূর্ব দক্ষতায়। দুটি অংশ এবং চব্বিশটি অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ভাবনা এবং তার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন। অতি সতর্ক রাধাকুমুদ যখন তথ্যের বিচ্ছুরণ ঘটান তার মধ্যে যেমন প্রামানিকতার প্রতি প্রবল যত্নের ছাপ থাকে আবার তেমনই তিনি ইতিহাসের তত্ত্ব-ভাবনা এবং বিশ্লেষণও বুনে দিতে পারেন অনায়াসে। তিনি শুধু তথ্য সমাহারে নয়, আমাদের আলোকিত করে তোলেন তার সুনিবিড় বিশ্লেষণের ঘনত্বে। তিনি ইতিহাস বিদ্যাচর্চার ভুবনে নিয়ে এসে ছিলেন সামগ্রীকতার বোধ যা আজকের সাংস্কৃতিক বিদ্যাচর্চার দ্বারা প্রভাবিত ইতিহাস রচনার প্রেক্ষিতে অত্যন্ত বিরল।

এই মহা-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বৈদিক ধারনাতন্ত্র এবং পরিভাষার জগত, দ্বিতীয় অধ্যায় আলোচিত হয়েছে ঋকবৈদিক শিক্ষার বিভিন্ন দিকগুলি, তৃতীয় অধ্যায় আলোচিত হয়েছে অন্যান্য বেদে শিক্ষা যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ, চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন উত্তর-বৈদিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান এবং তার আয়োজনগুলি প্রসঙ্গে, পঞ্চম অধ্যায় আলোচিত হয়েছে সূত্র সাহিত্যের শিক্ষা ভাবনা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পাণিনির সময়কালীন শিক্ষা, সপ্তম অধ্যায়ে উঠে এসেছে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং সেখানে শিক্ষার আয়োজন ও দর্শন, অষ্টম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে শিক্ষার আইনি ব্যাপ্তি, নবম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে সূত্র সাহিত্যের দর্শনগত অভিঘাতে শিক্ষা কি ভাবে এসেছে, দশম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে মহাকাব্যের আলোকে শিক্ষা এখানে নতুন এক গবেষণার বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন রাধাকুমুদ, একাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে প্রাচীন ভারতের শিল্প এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কিছু বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কেন্দ্র প্রসঙ্গে।

দ্বিতীয়পর্ব শুরু হয়েছে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে।এই পর্বে আলোচিত হয়েছে প্রধানত বৌদ্ধ শিক্ষার দর্শন এবং ধারা। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন সামগ্রিক বৌদ্ধযুগ এবং তার বৌদ্ধিক যাত্রাপথ প্রসঙ্গে। চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বৌদ্ধ শিক্ষার কাঠামো প্রসঙ্গে, পঞ্চদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে নিয়মতন্ত্র, ষোড়শ অধ্যায়ে এসেছে বৌদ্ধ গৃহ এবং আবাস ব্যবস্থা, সপ্তদশ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে নির্দেশ প্রসঙ্গে যেখানে সন্ন্যাসী হয়ে ওঠার বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষণের ভূমিকা এবং তার তাৎপর্য রাধাকুমুদ তুলে ধরেছেন, অষ্টাদশ অধ্যায়ে এসেছে শিল্প শিক্ষা, উনিশতম অধ্যায়ে এসেছে মিলিন্দ-পন্থা এবং তার শিক্ষা প্রসঙ্গে ভাবনার কথা, বিশতম অধ্যায়ে রাধাকুমুদ তুলে ধরেছেন, জাতকের ভাবনায় শিক্ষা কি ভাবে এসেছে তার আলোচনা, একুশতম অধ্যায়ে পঞ্চম শতাব্দীতে প্রধানত: ফা-হিয়েন এর বিবরণে শিক্ষা কিভাবে এসেছে তার আলোচনা করেছেন রাধাকুমুদ, বাইশতম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং এর ভাবনায় এবং লেখায় তৎকালীন শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন যেভাবে এসেছে তার প্রসঙ্গে, তেইশতম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ই-চিং-এর ভাবনা, চব্বিশতম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস।

এই অতি-সুনিবিড় মহা-গ্রন্থ শিক্ষা বিষয়ে কর্মরত উন্নয়ন পেশাদাররা কিভাবে গ্রহণ করবেন তা বলা শক্ত। তবে যদি অ্যাকাডেমিকসের ধূসরতা থেকে আবার রাধাকুমুদের ভাবনা এবং তার ইতিহাস যাপনকে সজীব করে তুলতে হয় তবে এর পাঠ-পুনর্পাঠ খুব জরুরী। কিন্তু প্রশ্ন হল বিপুল কর্মকাণ্ডের উত্তেজনা থেকে সৃজনের অবসর বেছে নিয়ে ফিল্ড অফিসের জানালা দিয়ে শীতের সকালে পেয়ারা গাছের ডালে কোন নতুন একটি পরিযায়ী পাখি দেখতে

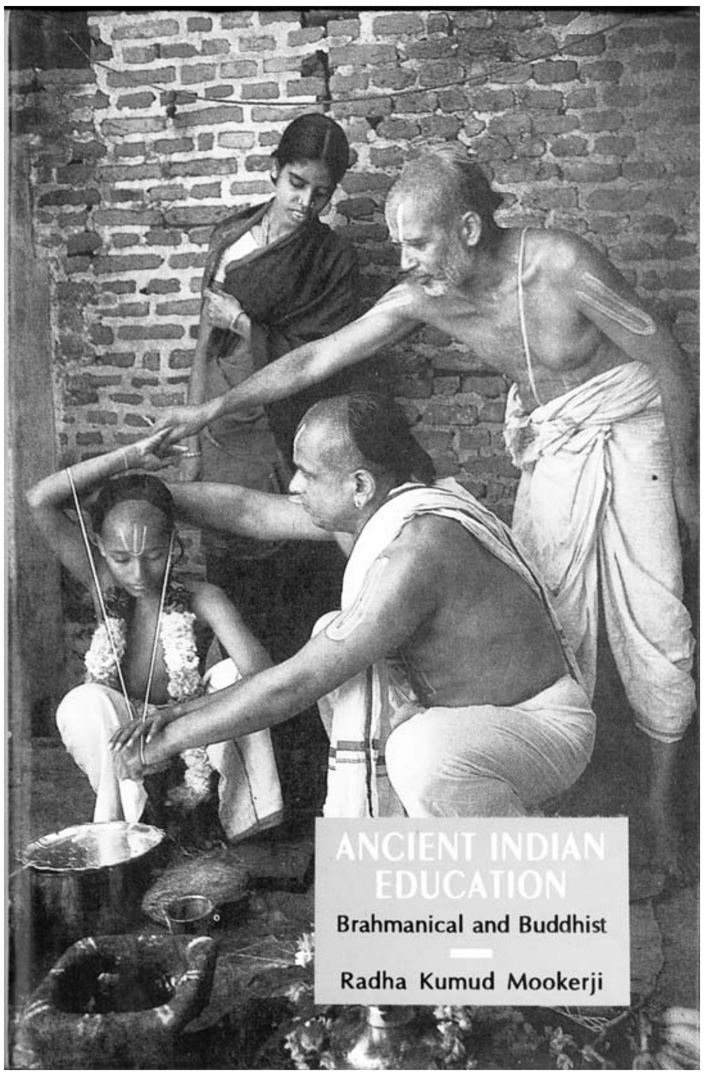

দেখতে একুশ শতকের কোন উন্নয়ন কর্মী রাধাকুমুদের এই মহা-গ্রন্থটি হাতে তুলে নেবেন কিনা। তবে যদি তাকে বুঝতে হয় শুধু রাষ্ট্র নয় সমাজেরও প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তবে এই মহা-গ্রন্থ তাকে এক নতুন চেতনার দিকে ধাবিত করবে। যে ধাবমানতা নিয়ে উন্নয়ন কর্মীরা ছুটে যাবেন শিক্ষাঙ্গন থেকে নতুন শিক্ষাঙ্গনে, যেখানে রাধাকুমুদের মতো করে শিক্ষক এবং শিক্ষার সাথে যুক্ত বন্ধুরা নতুন করে তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনাকে নবীকৃত করবেন। প্রতিটি শিক্ষাঙ্গন হবে সবুজ, যেখানে পরিযায়ী পাখিরা এসে বসবে, শিশুরা বইয়ের পাতায় নয়, বৃক্ষের সাথে সহবাসে জীবন ও প্রকৃতিকে স্পর্শ করবে, যে স্পর্শে প্রথাগত শিক্ষার বাঁধ ভেঙে স্থানীয় ভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার নান্দীপাঠ রচিত হবে, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং লোকাচারে সমৃদ্ধ হবে শিক্ষাঙ্গন এবং সেটাই হবে রাধাকুমুদের প্রতি প্রকৃত আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ। আসুন চেতনায় শান দিই।

■■

বিখ্যাত চিন্তাবিদদের ভাবনায় শিক্ষা

ইউনেস্কো (UNESCO) সংকলিত শিক্ষা চিন্তাবিদদের জীবন ও ভাবনার বিবরণ

জে. কৃষ্ণমূর্তি – মীনাক্ষী থাপান-এর ইংরেজী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তায়ন

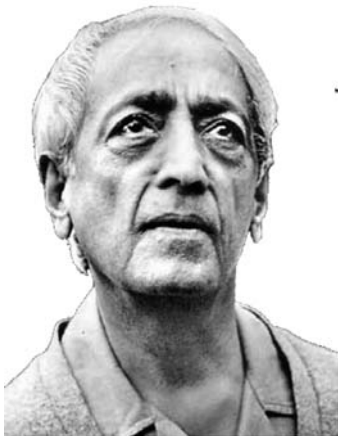

এমন স্কুলও হয় - যেখানে বিকেলের সূর্য দেখতে দেখতে ক্লাস চলছে। পাখির ডাক শুনতে শুনতে আর ঋতুর সঙ্গে বদলে যাওয়া গাছের পাতার রঙ দেখতে দেখতে পাঠের কাজ চলছে। পৃথিবীর মাটিকে অনুভব করার মধ্য দিয়ে শিক্ষা গ্রহণ চলছে। রোম্যান্টিক প্রকৃতিবিদের পর্যবেক্ষণ নয় – পৃথিবী – প্রকৃতিকে জড়িয়ে যে সামগ্রিক জীবনপ্রবাহ চলছে সেই ধারাটাকে দেখে – শুনে – বুঝে নেওয়ার চেষ্টাই এই স্কুলের পাঠক্রম। কৃষ্ণমূর্তি ফাউণ্ডেশন ইণ্ডিয়া (কে. এফ. আই.) পরিচালিত স্কুলগুলির পাঠ্যক্রম এমনই। বইপত্র সর্বস্ব জানা সব নয়। জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির দেওয়া-নেওয়া আর সামঞ্জস্য বজায় রাখতে শেখায় শিক্ষা।

জে ডি কৃষ্ণমূর্তি দার্শনিক ছিলেন কিন্তু প্রথাগত অর্থে শিক্ষাবিদ্ ছিলেন না। বাবার প্রভাবে তাঁর যৌবনের অনেকগুলো দিন এক বিশেষ আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় কেটে যায়। মাদ্রাজের (এখন অন্ধ্রপ্রদেশ) থিওসোফিক্যাল সোসাইটির সদস্য ছিলেন তিনি। সংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন – মন প্রাণ দিব্যজ্ঞানে ভরে থাকত। তবে সেটা একটা বয়স অবধি। থিওসোফিক্যাল সোসাইটির আশা ছিল কৃষ্ণমূর্তি "বিশ্ব-শিক্ষক" বা "সত্যের শিক্ষক" হয়ে উঠবেন। তাঁকে মাথায় রেখে তৈরি হল বিশেষ এক সম্প্রদায়। কৃষ্ণমূর্তি প্রশিক্ষণ পেতে থাকলেন যাতে বিশ্ব-গুরুর পদে আসীন হতে পারেন। কিন্তু দীর্ঘ অনুশীলনের শেষে যে জে. ডি. কৃষ্ণমূর্তি তৈরি হলেন তাঁকে থিওসোফিক্যাল সোসাইটি মোটেও তেমনটি আশা করেনি।

১৯২৯ এর এক ঐতিহাসিক বক্তৃতায় তিনি যে সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব পেয়েছিলেন সেই সম্প্রদায়টিকে ভেঙে দিলেন। নিজেকে সবরকম কর্তৃত্ব, কর্তৃপক্ষ, আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত ঘোষণা করলেন। তাঁর চিন্তা ভাবনা জুড়ে থাকল "সু-সমাজ" – এর খোঁজ, যার ভিত্তি হবে "যথার্থ মূল্যবোধ" আর "যথার্থ সম্পর্কের বন্ধন"।

তাঁর মুক্ত ভাবনা তাঁকে মুক্ত করলো গুরু-নির্দেশিত পথ থেকে। জীবন মানে তাঁর কাছে অন্তহীন পথে হেঁটে চলা – একা। সে পথে জানাবোঝা-ই সঙ্গী। এপথে কোন গুরু/ শিক্ষকের পথ নির্দেশ লাগে না। এপথের পাথেয় মুক্তমন। যে মন দেখবে, লক্ষ্য করবে ও শিখবে। নিজেকে আবিষ্কার করতে করতে এই জানাবোঝার পথ চলা চলে, আর প্রতিটি ব্যক্তির এই আত্ম-আবিষ্কার আর তার বাইরের পৃথিবী-প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সমন্বয় রেখে চলবে। বাইরের আর অন্তরের সমন্বয় সাধন প্রতিফলিত হবে পরিবেশে, সমাজে। ব্যক্তির সৌন্দর্য, শুভবোধ ছড়িয়ে পড়বে পরিবেশে, সমাজে। তৈরি হবে সু-সমাজ। আর এই অন্তরের বদল – নবীকরণের মূলে থাকবে শিক্ষা। এই শিক্ষাই আবার হবে সমাজ বদলের হাতিয়ার।

তাই কৃষ্ণমূর্তি বাতিল করেছেন সেই শিক্ষাকে যেখানে "আগে পাঠ করতে হয় পরে কাজে করে দেখাতে হয়"। শিক্ষা তার কাছে ভাগ করে নেওয়ার, অংশ নেওয়ার। শিক্ষাকে দান করা যায় না, গ্রহণ করা যায় না।

আজকের এই ভয়ঙ্কর প্রতিযোগীতাপূর্ণ সমাজে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণমূর্তি জোর গলায় বলেন "তুমি প্রতিযোগীতায় অংশ নিও না। ইঁদুর দৌড়ের চূর্ণ – দাগে পা রেখো না যদি তুমি অনাবিল আনন্দের ভাগীদার হতে চাও"।

আবাস্তব লাগছে! কৃষ্ণমূর্তি ফাউণ্ডেশনের স্কুলগুলিতে প্রতিযোগী-তার লেশমাত্র নেই। এই স্কুলগুলির পাঠক্রম ছাত্র-শিক্ষকের "বিকাশে"

কৃষ্ণমূর্তির চিন্তাভাবনায় তৈরি 'ঋষিভ্যালি' স্কুলের কিছু দৃশ্য

বিশ্বাস করে। স্কুলগুলি উন্মুক্ত – প্রকৃতির বুকে প্রকৃতির রস-রূপ-গন্ধকে জড়িয়ে ধরে বেঁচে থাকে। বই-মুখী বিদ্যা এখানে চলে না। রেজাল্ট ভালো করার রেশারেশি নেই। নতুন নতুন তথ্য আর তত্ত্ব মেলে কিছু বিষয়ে দক্ষ মানুষ তৈরি করা এই স্কুলগুলির লক্ষ্য নয়। স্কুলগুলির পাঠক্রম দাবী করে – উত্তম আচরণ, ভালো ব্যবহার – কাজ ও সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা।

কৃষ্ণমূর্তির কাছে "আত্ম-বিশ্বাস" ধারণাটির জায়গা ছিল না। তাই ওনার চিন্তা ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলিতে সব রকমের আত্ম বা অহংকে হটিয়ে দিয়ে বিশ্বাস-আস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। আমাদের চেনা জানা স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের কাজকর্মের মূল্যায়ন ও বিচার প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। এই মূল্যায়নের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একধরনের তুলনা। যার ফলে ক্লাস ঘরে থাকে দ্বন্দ্ব, ভীতি, অসহায়তা। কৃষ্ণমূর্তির ফাউণ্ডেশন স্কুলগুলিতে শিক্ষকেরা এই তুলনা আর প্রতিযোগী আবহাওয়া বন্ধ রাখতে বিশেষ ভাবে সচেতন থাকেন। কৃষ্ণমূর্তির কাছে যথার্থ শিক্ষার (যা সু-সমাজের জন্ম দেবে) ভূমিকা হলো ব্যক্তিকে তার চারপাশের সব কিছুর প্রতি সংবেদনশীল করে তোলা। শিক্ষার ভূমিকা অংক-ভূগোলে পারদর্শীতা তৈরি করা নয় বা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করা নয়। শিক্ষার কাজ একজন যথার্থ মানুষ তৈরি করা, যে বিশেষজ্ঞ হবে না। শিক্ষিত হয়ে সে হয়ে উঠবে এক সার্বিক সত্তা। শিক্ষিত মন ভাববে, চিন্তা করবে, সক্রিয় থাকবে – জীবন্ত – প্রাণবন্ত – থাকবে।

কৃষ্ণমূর্তির কাছে "অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণ হলো সম্পর্কিত থাকা – সম্পর্কে থাকা"। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক – মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির। এর মূল কারণ প্রতিটি ব্যক্তি বিশেষ এই বিশ্বসংসারের সঙ্গে যুক্ত – আলাদা নয়। কৃষ্ণমূর্তি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিচেতনার বদলে সমবেত চেতনায়।

আধুনিক ভারতের প্রেক্ষিতে কৃষ্ণমূর্তি শিক্ষা চিন্তা কোথায় স্থান পেয়েছে বা পাবে ?

আমাদের সামনে কী রয়েছে? রয়েছে ভারতীয় শিক্ষানীতি – যাতে জায়গা পেয়েছে সমাজ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মতো চিন্তা ভাবনা। শিক্ষানীতিতে স্থান পেয়েছে শিক্ষার প্রভাব পৌঁছে দেওয়ার জন্য নানান উদ্যোগের কথা – সরকারি প্রচেষ্টায় সর্ব সাধারণের জন্য আবশ্যিক শিক্ষাক্রম, কন্যাশিশুদের জন্য শিক্ষা, প্রাথমিক – মাধ্যমিক - উচ্চস্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা এমনকি বেসরকারি উদ্যোগে শিক্ষাদান। পিছিয়ে পড়া জাতির কাছে শিক্ষাদান। পিছিয়ে পড়া জাতির কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কিন্তু শিক্ষানীতির কথা – ভাষা – ইচ্ছার সঙ্গে বাস্তবের ঘটনার বিপুল ফারাক। চারদিকে শিক্ষার ব্যর্থতা। শিক্ষার সঙ্গে জীবিকা জোগাড়ের যোগ নেই তাই শিক্ষিত হয়ে কাজ জোগাড় করা যায় না। সাক্ষর শিক্ষিত মানুষ তার পরিবারের জন্য স্বচ্ছলতা এনে দিতে পারছেন না – পারছেন না মানসিক সহায়তা এনে দিতে।

চারদিকে এক মূল্যবোধের অবক্ষয়। এটা কী আমাদের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির দান নয় ? কোথাও কী শিক্ষার মর্মার্থ ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে ?

কৃষ্ণমূর্তির দর্শন স্থান পেয়েছে আমাদের দেশের প্রথাগত স্কুলের পরিবেশ বিজ্ঞানের পাঠক্রমে। কে এফ আই স্কুলগুলির পরিবেশ বিদ্যায় পরিবেশ – প্রকৃতির নবীকরণ জায়গা করে নেয়। পরিবেশ বিদ্যার পাঠক্রমে এমন সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যার সাহায্যে স্কুল সংলগ্ন স্থানীয় কমিউনিটি পরিষেবা পায়। ফলে কমিউনিটির সঙ্গে স্কুলগুলির সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এই কমিউনিটির পরিবেশ বিস্তার ঘটে, আরো বড় মাত্রা পেয়ে যায়। আমাদের দেশের কিছু বোর্ড (যেমন আই. সি. এস. ই.) কৃষ্ণমূর্তি ফাউনডেশনের পরিবেশ বিদ্যার বিষয়টি গ্রহণ করেছে।

কৃষ্ণমূর্তি ফাউনডেশন পরিচালিত কয়েকটি স্কুল চেন্নাই, মুম্বাই, পুনা ও উত্তরপ্রদেশের মতো জায়গায় ছড়িয়েছে। চেন্নাইয়ের কাছে মাদানাপল্লী (কৃষ্ণমূর্তির জন্মস্থানে) সংলগ্ন উন্মুক্ত মনোরম পরিবেশে তৈরি হয় ঋষি ভ্যালি এডুকেশন সেন্টার কে এফ আই পরিচালিত প্রথম স্কুল।

ঋষি ভ্যালি এডুকেশন সেন্টারের অন্তর্গত রুরাল এডুকেশন সেন্টারটি, মাদানাপল্লীর আশেপাশের গ্রামগুলিতে তার নেটওয়ার্ক বিস্তার করে চলেছে। এর সাহায্যে পাশাপাশি বহু গ্রামে গুণগত মানের প্রাথমিক শিক্ষা পৌঁছে গেছে। তৈরি হয়েছে দুটি "হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য" বহুস্তরীয় স্কুল। ১৬টি বহুস্তরীর ছোট ছোট স্কুল, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বাস্তবের শ্রীহীন প্রাথমিক স্কুল যেখানে ঘুপচি ঘরে, একঘেয়ে সুরে একক শিক্ষক একপাল বাচ্চাকে নিয়ে ক্লাস করেন। সেখানে ছাত্র অনুপস্থিতি ভীষন সমস্যা, অনুপ্রেরণা এবং উদ্যোগের অভাব। অর্থ নেই, শৌচালয়হীন, পানীয় জলের ব্যবস্থাও নেই। এই পরিস্থিতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঋষি ভ্যালির রুরাল এডুকেশন সেন্টার তৈরি করেছে "এক বাক্সে স্কুল" প্রকল্প। এই ব্যবস্থায় রয়েছে নিজে নিজে শিখে ফেলা যাবে এমন উপকরণ। উচ্চমানের অথচ ছাত্র-বন্ধু, ছাত্র-উপযোগী, চেনা-জানা বিষয়বস্তু দিয়ে তৈরি শেখার উপকরণ সঙ্গে থাকছে কমিউনিটির সঙ্গে সংযোগকারী বিষয়। এই "এক বাক্সে স্কুল" প্রকল্পটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে। সরকারি, প্রথা-বহির্ভূত ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা সংস্থাগুলি রুরাল এডুকেশন সেন্টারের এই প্রকল্প থেকে সাহায্য নিচ্ছে।

NCERT তাদের ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কে মূল্যবোধ শিক্ষার বিষয়টি যোগ করেছেন। যেখানে স্থান পেয়েছে–নিয়মানুবর্তিতা, পরিচ্ছন্নতা, অধ্যবসায়, পরিশ্রমী, পরিষেবা ও কর্তব্যবোধ, সাম্যতা, সহযোগীতা, ও সত্যতার মতো মূল্যবোধগুলি। আশা করা হচ্ছে স্কুল পাঠক্রমের মাধ্যমে ক্লাসঘরে ছড়িয়ে পড়া এই বোধগুলি লড়বে সমাজ জুড়ে গেঁড়ে বসা অজ্ঞানতা, ধর্মান্ধতা, হিংসা, কুসংস্কার ও দুর্দশাগ্রস্থতার বিরুদ্ধে। আমাদের দেখতে হবে বোধগুলো কি উপর থেকে "বাণীর" মতো চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাকি বোধগুলো সৃষ্টি হচ্ছে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে! এখানেই প্রয়োজন কৃষ্ণমূর্তির যথার্থ শিক্ষা ধারনার। যে শিক্ষা রূপান্তরকামী। আমাদের শিক্ষানীতি সেই রূপান্তরকামী যথার্থ শিক্ষাকে প্রতিফলিত করবে তো ?

"সত্যকার শিক্ষা মানে কতকগুলো তথ্য মুখস্ত করে পরীক্ষার প্রাচীরটা পেরোলাম এমন নয়, এর অর্থ জীবনের তাৎপর্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা ।"

- জে.কৃষ্ণমূর্তি

এভাবেও গড়ে তোলা যায়

..... প্রথম পাতার পর

আশপাশ থেকে কথা উঠল, "মাষ্টার মশায় আপনি ঝাড়ু দিচ্ছেন?"

"আপনি বাথরুমে জল ঢালছেন?"

"মাষ্টার মশায় চারটে তো কখন পার হয়েছে এখনও?"

"আজ শনিবার আজও মিড-ডে-মিল?"

উত্তরে মাষ্টার মশায় সামান্য হেসে বলতেন, "আমাদেরই তো স্কুল।" আমি, হাসানুর, দিদি অনেকবার বলেছি এবার আমাদের ঝাঁটাটা দিন মাষ্টার মশায়।

উনি হেসেছেন আগের মতো কিংবা যেমন হেসে থাকেন। এবার শুরু হল আরো ডবল উদ্যোগে একে গোপালন কলোনির বাড়ি বাড়ি ঘোরা। পরিবর্তন হল খানিকটা।

উদাহরন হিসেবে মদনদার কথা বলি। মদনদার টেপ, টিভি, রেডিও সারাই ও সাউণ্ড সিস্টেম ভাড়া দেওয়ার একটা দোকান থেকে অনায়াসে এক খানা সাউণ্ড সিস্টেম পাওয়া গেল। মদনদা হাসি মুখে আমাদের দিয়ে দিলেন। বললেন, আমার মেয়ে তো আপনাদের ইস্কুলেই পড়ে, আর নাচ শেখানোর দিন ভাড়া নিই কী করে? তাই ওটা আপনারা রেখে দিন যতো দিন খুশি। কয়েকদিন যেতেই মাষ্টার মশায় ছাত্রছাত্রীদের নাম মুখস্থ করে ফেললেন। হইহই করে সামনের ছোট্ট পার্কটাতে নিয়ে যেতে থাকলেন, কংগ্রেস ভবনের মাঠে যা খুশি খেলা শুরু হল। কাউকে কাউকে হাত ধরে আর অন্যদের লাইন করে নিয়ে এলেন। আশ্চর্যের কথা অতি দুরন্তরাও মাষ্টার মশাইয়ের লাইন ধরে দুষ্টু হাসি মুখে আসতে থাকলো স্কুলে। এভাবেই চলছে। হাজার সমস্যাতে চুপটি করে না বসে শুধু স্কুলের জন্য এমন একপেশে ভেবে যাওয়া মাষ্টার মশায় এই সময় এতটাই অল্প যে অনেকেই অবাক। না চাইলেও অবাক। আমাদের স্কুলের বাড়তি দুটো বোর্ডে যা খুশি আঁকা যায়। এ সপ্তাহের ছবি বলে একটা বোর্ড বাইরে ঝুলিয়ে রাখতেই সমস্যা দেখা দিল। সমস্যাটা বলি – ভাবা হয়েছিল কেউ একজন একটা ছবি আঁকবে বোর্ডে তাতে নাম লিখে এক সপ্তাহ রাখা হবে। প্রতি সপ্তাহে একজন একজন করে। হেড মাষ্টার মশায় সব শুনে বললেন, খুব ভালো, খুব ভালো। কিন্তু কাজটা ভাল হল না এক সপ্তাহের প্রথম ছবি আঁকলো ক্লাস থ্রি-র বিবেক, একটা ছোট বাড়ি তার পাশে একটা রাস্তা, রাস্তার পাশে ছোট্ট একটা গাছ। গাছের নীচে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা গাছ লাগান। ছবি শেষ হতেই মাষ্টার মশায় বললেন বাহ্ ! বেশীক্ষণ হয়নি অন্য ঘরে ক্লাসে আছি, বিবেক দৌড়ে এল, স্যার আমার ছবি নষ্ট করে দিল। সঙ্গে ক্লাস ওয়ানের সুফল যার প্রধান কাজ অন্যের যে কোনও কথা রিপিট করা। সুফল বলল "হ্যাঁ স্যার সত্যি, ছবিটা নষ্ট হয়ে গেছে।" এ সপ্তাহের ছবির বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আমি অবাক। ছোট বাড়ি, গাছ, রাস্তা, হুবহু আছে শুধু জুড়ে গেছে নতুন কয়েকটা তা হল রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে স্বয়ং ডোরেমন, ডোরেমন হাসছে এবং তার হাতে অনেক গাছ। ডোরেমনের পায়ের কাছে কাছে লেখা আমি ডোরেমন, ডোরেমনের মাথার উপরে একটা পেঁচা, আকাশে পাখি, একেবারে বোর্ডের শেষের দিকে একটা পুকুর। যেমন তেমনর পুকুর নয়। একটা আশ্চর্য পুকুর। যাতে ফুল যেমন ফুটে আছে, তেমনি মাছ ঘুরছে সেটাও দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত বদল, ১) এ সপ্তাহে আমার ছবির বদলে নাম হল- এ সপ্তাহে আমাদের ছবির। ২) একটা বোর্ডে কিছুতেই হবে না তাই দুটো বোর্ড।

আজকাল আর দুটো বোর্ডে হচ্ছে না। যে কেউ এসে যখন তখন নালিশ করে, স্যার আমার মাছের পাশে পিউ একটা বিড়াল এঁকেছে, কিংবা, স্যার আমার সমুদ্রের মধ্যে একটা বাড়ি এঁকেছে। এখন বাড়িটার কী হবে! এসব হয়। আমাকে বোঝাতে হয় না। মাষ্টার মশায় খুব সহজেই সেসব নিস্পত্তি করেন। নিস্পত্তি করা সহজ না, কারণ সমুদ্র থেকে বাড়ি বাঁচানো কিংবা হাসি মুখের বিড়ালের পাশে অবাক চোখে মাছ সব থেকে যায়। বড়রা ছোটদের পছন্দ খুব করে, ছোটরা সহজে করে না। কথাটা ভুল হয়ে যায়। যে কোনো ভাল কাজে সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ করা, তার জন্য ছোটাছুটি করা, মানুষটাকে ছোটরাও চিনে গেছে। আসলে ছোটরা মোটেও ছোট নয়।

আর মাত্র কয়েকটা দিন। হয়তো বা আর দুটো মাস। তারপর আমাদের হেড মাষ্টার মশায় চলে যাবেন, সার্ভিস বুকের হিসেবে – এই সবও শুনছি, জানি। তবে বিশ্বাস করি না। সময় বড্ড যাচ্ছেতাই ভাবে যাই যাই করে। তাই একটা পুজো চলে যায়, আরেকটা আসে, ঈদ যায় ঈদ আসে, ছুটি শেষ হয়। রবিবার শেষ হয়ে দুম করে সোমবার আসে। হয়তো এটাই ভয়ংকর হলেও নিয়ম। তবু কিছু ক্ষেত্রে নিয়ম ঠিক কাজ করে না। সার্ভিস বুকের হিসেব নিকেশের পরও ন'টা বাজবে, দশটা বাজবে ছাত্রদের আসা দেখতে পাবেন উনি ------। সব্বাই পারলেও দিলীপ কুমার সাহা পারবেন না, স্কুলে না এসে। আসবেন উনি আসবেন।

ক'দিন আগে গভীর চিন্তা করে বের করেছি, ওনার চায়ে এতো মিষ্টি বেশী হয় কেন ? উত্তর হল, এত ভালোবাসা নিয়ে প্রতিদিন ক্লাসের ফাঁকে আমাদের জন্য বাড়ি বয়ে চা এনে খাওয়ান তাতে চিনির সঙ্গে ভালোবাসা জুড়ে মিষ্টিটা ডাবল হয়ে যায়। কে না জানে ভালোবাসা মিষ্টি। ওনার জন্যে আমাদের অজস্র ভালো জুড়ে যাচ্ছে রোজ। যেমন –

১) স্কুল ছুট এক ছাত্র চার মাসে মাথা চুলকে বলছে। আচ্ছা মাষ্টার মশায় আমি এত অঙ্ক পারি কী করে ?
২) দুটো অঙ্ক, এক পাতা হাতের লেখা শেষ করে কেউ নেচে নিচ্ছে, কেউ ডোরেমনের মাথার উপরে খান কয়েক প্রজাপতি এঁকে দিচ্ছে।
৩) আমার বিদ্যালয় রচনা কাউকে শেখাতে হচ্ছে না, সব্বাই লিখছে আমার ইস্কুল খুব ভালো।

এত্ত কিছুর পর সহজে যাওয়া যায় না। ফিরে আসতে হয়। পিছুটান বড্ড ঘ্যানঘ্যান করে। স্কুলের গেঁটে গ্রিল ধরে আপনি নেই, এটা মানাবে না। আপনাকে ছাড়া স্কুলটা বড্ড কষ্ট পাবে। খুব মন কেমন করা দিনে ছোট্টরা এসে বকুল ফুল বিছিয়ে রাখবে কার জন্যে ? কার টেবিলে?

তাই আরো দু'মাস বা কোনো দিনক্ষনের হিসেবে নয় আপনি আমাদের সঙ্গেই আছেন থাকবেন কারণ আপনি ছোটদের স্কুল জীবনের আশ্চর্য ভালো মাষ্টার মশায় হয়ে গেছেন নিজের অজান্তেই। তাই আপনার কোথাও যাবার নেই।

শুভ্রদীপ চৌধুরী
নারায়নপুর জি.এস.এফ.পি. বিদ্যালয়
নারায়নপুর বালুরঘাট দঃ দিনাজপুর

■■

শিক্ষার্থীরা কোন জীববিদ্যা শেখে

"এইসব শিশুরা বিজ্ঞানই বোঝে না...... ওরা একেবারে বঞ্চিত, অজ্ঞাত পরিবেশ থেকে আসে!"

– প্রায়শই গ্রামীণ কিংবা আদিবাসী পরিবেশ থেকে আসা প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে কী শেখে তা দেখা যাকঃ

রামী, শুশুনিয়া পর্বতের একটি ছোটো গ্রামে বাস করে। সে ধান ও জোয়ার চাষের মরশুমি কাজে তার বাবা-মাকে সাহায্য করে। কখনো ভায়ের সঙ্গে ছাগল চরাতে বনে যায়। আর তার ছোটোবোনের দেখাশোনার জন্য মাকে সাহায্য করে। এখন সে প্রায় আট কিলোমিটার হেঁটে সবচেয়ে কাছের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসে।

প্রকৃতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সংযোগ। খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি কাঠ, রঙ এবং ঘর তৈরির উপাদানের মজুত ভাণ্ডার হিসাবে সে বিভিন্ন গাছপালা ব্যবহার করেছে। গৃহস্থালি কাজে, নানা ধর্মীয় আচারে এবং উৎসব উদযাপনে বিভিন্ন উদ্ভিদের নানা অংশ পর্যবেক্ষন করেছে। বিভিন্ন বৃক্ষের মধ্যে যে সূক্ষ্মতম পার্থক্য তা তার পরিচিত এবং বিভিন্ন মরশুমে তাদের আকার, আয়তন, পাতা ও ফুলের বিন্যাস, গন্ধ এবং চেহারায় কী কী পরিবর্তন হয় তাও সে লক্ষ্য করে। তার জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক যত বিচিত্র উদ্ভিদ চেনে তার চেয়ে শতগুণ বেশি বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ তার পরিচিত, - সেই শিক্ষক/শিক্ষিকা যিনি বিশ্বাস করেন যে, রামী খুবই খারাপ ছাত্রী।

আমরা কি রামীর এই সমৃদ্ধ বোধের ভাণ্ডারকে জীব-বিজ্ঞানের প্রথাবদ্ধ ধারনার ভাণ্ডারে অন্তর্ভুক্ত করার কাজে সাহায্য করতে পারি ?

আমরা কি তাকে এই বলে আশ্বস্ত করতে পারি যে বিদ্যালয়ের জীবনবিজ্ঞান কেবলমাত্র লম্বা লম্বা পাঠ্যাংশে নানান পরিভাষা সম্বলিত কোনো এক অবাস্তব জগতের কথা নয়। বরং যে খামারে সে কাজ করে, যে পশুদের সে চেনে, যে অরণ্যের সে পরিচর্যা করে, যার মধ্যে দিয়ে সে রোজ হাঁটে এসব তাদের নিয়েই লেখা। কখনো যদি পারি, একমাত্র তখনই সে প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞান শিখবে।

National Curriculum Framework (2005) বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠাঃ ৪৪

■■

নবদিশা-র সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রবি রায় কর্তৃক ৫/১/২/জি কর্ণফিল্ড রোড, কলিকাতা – ৭০০০১৯ হইতে প্রকাশিত ও শান্তি মুদ্রণ, ৩২/৩ পটুয়াতলা লেন, কলকাতা – ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY